রূপ-রেখা

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

প্রকাশক—
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স্।
৯০।২এ, হ্যারিসন্ রোড
কলিকাতা।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

Printed by R. K. Rana
Cherry Press Ltd.
93-1A, Bowbazar Street,
Calcutta.

আমার বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশে

রূপ-রেখা

উৎসর্গ করলাম।

নিবেদন।

আমার এই লেখাগুলি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আকারে ছোট হলেও এগুলি ছোটগল্প নয়, কারণ প্লট বা ছক্ বজায় রেখে চলবার প্রয়াস এতে নেই। শুধু রেখার সাহায্যে জীবনের কান্নাহাসি এবং বিশেষ করে অভাব এবং অতৃপ্তির ছবিটুকুই প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস, শ্রীসতীপ্রসাদ সেন, শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী ও শ্রীপ্রভাতকুমার দে মহাশয়ের কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁদের সাহায্য না পেলে আমার একলার ক্ষমতায় বই ছাপানর মত বিরক্তিকর কাজ সুসম্পন্ন হত না। আর যাঁরা আমাকে চিরদিন উৎসাহ দিয়ে এসেছেন, তীব্র ভাবে সমালোচনা করে এসেছেন আমার লেখার, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আজ আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যদি কিছু এমন লিখে থাকি যা প্রাণে ভাল লাগে, তৃপ্তি দেয়, তা তাঁদের সাহায্যেই পেয়েছি, এ কথা আমার চিরদিন মনে থাক্‌বে।

ইতি—

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

আলিপুর,

১লা বৈশাখ ১৩২৯।

সূচী পত্র।

রূপ-রেখা

মালিনী

প্রভাত-আলো, দেবশিশুদের মুখের হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে ছুটে এসে, পুষ্পপাত্রের ওপর বিছান ফুলশয্যায় লুটিয়ে পড়্‌ল। স্বর্ণ-চামেলির মুখ সে স্পর্শসুখে আরক্তিম হয়ে গেল। মুগ্ধ কালো ভ্রমরের দল, অনুরাগে তাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছেই, মালিনী বিরক্ত হয়ে বল্‌ল—এখানে নয়। ওরা তোমাদের নয়, দেবের।

ভ্রমরের দল মিনতি করে কান্নার সুরে বল্‌ল—ওরা যে আমাদেরই, পথ ছাড়...

তবু মালিনী হাত নেড়ে তাদের সরিয়ে দিয়ে বল্‌ল—এখানে নয়, ওরা তোমাদের নয়, দেবের...

ভ্রমরের দল হতাশ হয়ে উড়ে গেল, কিন্তু কান্নার সুরটি তারা রেখে গেল কেতকী ফুলের গন্ধে আকুল হাওয়ার বুকে।...

হিমশীতল জলের কণা, ফুলের ওপর ছিটিয়ে মালিনী বল্‌ল—দেখ্‌, শিউলি, তুই যেন মানুষের চোখের জল! কান্না যখন [illegible], তখন বুকখানিকে চূর্ণ করেই ঝরে, কিন্তু [illegible] হৃদয়কেই কাঁপিয়ে যায়। তোরাও ঝরিস্ তেম্‌নি করেই। কারেও

দেখ্‌বার অবসর দিস্ না! চেয়ে দেখ্‌ত ঐ বকুলের দিকে। ওরা ঝরে, ঝরাও শুখায়, কিন্তু ওদের [illegible], ওদের হাসি, অতীতের স্বপ্ন হয়ে গন্ধটুকুর বুকে ভরে থাকে। সে স্বপ্নের এক কণাও হারিয়ে যায় না।...

—আর মাধবী, তুই কি কোন দিনই তোর কথা কারেও বল্‌বি না? মানুষের ঘরে তোর মত স্বভাবের অভাব নেই। তারা সবারই চোখের সাম্‌নে দিন কাটায়; ব্যথা, আনন্দ তাদের বুকের ভিতর গুপ্ত উৎসের মত তরঙ্গ তোলে; কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ কেউ দেখ্‌তে পায় না...তুই থাকিস্ তেম্‌নি করেই নিজের কান্না-হাসি নিজেরই বুকে চেপে ধরবে; তাই তুই আছিস্ কি নেই তা কারো আর মনে থাকে না...চেয়ে দেখ্‌ত ঐ গোলাপের দিকে, লক্ষ হিয়ার হাসি যেন রূপ ধরে ফুটে উঠেছে...তাই সবাই সেই হাসিটুকু বুকে নেবার জন্যে পাগল ...ওর নিশ্বাসের আঘ্রাণ নিতে গিয়ে, ওর মুখে চুমা না দিয়ে কেউ থাকৃতে পারে না। কি তৃপ্তি ঐ হাসিতে লুকিয়ে রেখেছে ও... কিন্তু তুমি কে গো? তোমায় ত কোন দিন দেখি নি... তুমিত আমার বাগানে ফোটা ফুল নও—চোখে ও কি পরেছ, কাজল? না, চোখের পাতা অত কালো...তোমার ঠোঁট-দুটি যে গোলাপকেও হার মানাল...কি চমৎকার হাতের আঙুলগুলি! রাঙ্গা কলীদুটি বেশ মানিয়েছে...পায়ে ও কি পরেছ, আল্‌তা? না অম্‌নি রাঙ্গা ও দুটি!...কে তুমি গো আমার ঝুম্‌কগাছের তলায় দাঁড়িয়ে?

সে বললে—আমি চাঁপা। তোমার ঐ বাগানের পশ্চিম দিকের মাঠের পারেই আমার বাড়ী। আমি ইন্দুরেখার মেয়ে, আমায় চিনতে পারছ না?

মালিনী যেমন করে ফুলগুলির সঙ্গে কথা বলছিল, তেমনি করেই চাঁপার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—না, কি করে চিনব? কুঁড়িটি যখন ফোটা ফুল হয়ে যায়, তখন তার রূপ, চোখ দুটিকে এমন করে ভরিয়ে তোলে, যে সেই কুঁড়িবেলাকার রূপের স্মৃতির দিকে তাকাবার কথা আর মনেই থাকে না। তুমি কি সুন্দর হয়েই ফুটেছ চাঁপা...

চাঁপা, মালিনীর মুখের দিকে তাকাল। তার চোখের পাতায় অশ্রুকণা, শিশিরমাখা পদ্মপলাশের মত; মুখে ম্লান হাসির রেখা, বড় করুণ...

মালিনী অবাক হয়ে বললে—ওকি! ব্যথার অশ্রু ত তোমার চোখদুটির জন্যে হয় নি...ও বিষাদমাখা হাসি ত তোমার মুখে থাকবার নয়!...

চাঁপা হাত বাড়িয়ে বললে—ঐ বড় মালাছড়াটার কত দাম?

মালিনী বললে—ঐ সবার বড়টা? ওর দাম, একটাকা চার আনা।

চাঁপার মুখের হাসিটুকু আরো ম্লান হয়ে গেল। সে বললে—কিন্তু আমার কাছে'ত অত পয়সা নেই...শুধু চারআনা আছে।

হেসে মালিনী বললে—তাহলে এক কাজ কর না কেন, ঐ পয়সা দিয়ে কিছু ফুল নিয়ে যাও।

চাঁপা বল্‌ল—না—না, ঐ মালা। ওটাই আমার চাই...

মালিনী বল্‌ল—কিন্তু ওটা নেবার মত ক্ষমতা ত তোমার নেই?

চাঁপা বল্‌ল—তবু ওটাই আমার চাই যে...শুধু ফুলে হবে না।

কি হবে না?

পূজো।

কিন্তু পূজো ত সকলে ফুল দিয়েই করে থাকে চাঁপা?...

চাঁপা বল্‌ল—আমার ঠাকুরের পূজো শুধু ফুলে হবে না... মালা চাই।

তার চোখ থেকে জলের ফোঁটা তারই হাতের ওপর পড়ে গেল।

মালিনী চাঁপার কাছে সরে এসে বল্‌ল—মালা দিয়ে মানুষ মানুষকে পূজো করে চাঁপা, ঠাকুরকে নয়...

চাঁপা মালিনীর মুখের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে এসে বল্‌ল—আমার ঠাকুরকে যে মানুষের মধ্যেই পেয়েছি...

মালিনীর স্বপ্নভরা চোখে জল ছাপিয়ে উঠ্‌ল। সে ছুটে গিয়ে মালাটি এনে চাঁপার হাতে দিয়ে বল্‌ল—এই নে—এই নে বোন। আর চাস্? আচ্ছা, এটাও নে...আর ও ফুলগুলো নিবি? যা নিয়ে যা...ভারি মিষ্টি গন্ধ ঐ চামেলির। নিয়ে যা সব...আমার ঢের আছে। কি হবে অত ফুলে?...

চাঁপা ব্যস্ত হয়ে বল্‌ল—না—না আমার অত ফুলে দরকার

নেই।...শুধু এই মালাটিতেই হবে। আর কিছু চাই না, কিন্তু এর দাম যে দিতে পারছি না...কি করে নেব?

মালিনী বল্‌ল—কাজ নেই আমার দামে...তুই শুধু ওটা দয়া করে নিয়ে যা। বড় সুখী হব...আচ্ছা দে তোর ঐ চার-আনা পয়সা। ফুল বেচে এত তৃপ্তি জীবনে পাই নি...

মালিনীর গলা জড়িয়ে ধরে চাঁপা বল্‌ল—আমার পূজো ব্যর্থ হবে না, তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে তা জেনেছি... পূজো শেষ করে তোমার পায়ের ধূলো নিয়ে যাব...এখন আসি?...

মালিনী তার চিবুকের স্পর্শ আঙুল দিয়ে মুখে নিয়ে বল্‌ল—আয় বোন...

* * * *

শ্বেতচন্দনমাখান রূপোর থালা বাড়িয়ে দিয়ে রাজকন্যার দাসী বল্‌ল—রাজকন্যার পূজোর মালা দাও।

কলাগাছের সুতো দিয়ে কুন্দফুলের মালা গাঁথ্‌তে গাঁথ্‌তে মালিনী বল্‌ল—মালা পৌঁছেছে।

অবাক হয়ে দাসী বল্‌ল—কে নিয়ে গেল...কোথায়?

মালিনী বল্‌ল—ঠাকুরের গলায়...

বিরক্ত হয়ে দাসী বল্‌ল—তুমি কি পাগল হলে না কি? রাজকন্যা ত এখনও পূজোয় বসেন্‌ নি!

মালিনী বল্‌ল—একজন দুঃখীর মেয়ে করেছে। তার পূজোতেই সবার পূজো সারা হয়েছে...

দাসী রেগে বল্‌ল—বল্‌লেই ও হয়! মালা তৈরি হয় নি...
এখন কি করি—রাজকন্যাকে কি বল্‌ব?

মালিনী তেমনি শান্তকণ্ঠে বল্‌ল—বলো, মালা ঠাকুর পেয়েছেন...

দাসী ফিরে গেল। মালিনী গেল তার ফুলবাগানে, জলের ঝারি আর খুরপা হাতে নিয়ে, দিনের কাজে।

• • • •

দিনের আলো নিভে গেছে। পশ্চিম আকাশের গায়ে সন্ধ্যা-তারার মুখখানি, অল্প অল্প করে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ছে। শিরীষ-গাছের পাতাগুলি ঘুমেভরা চোখের মত বন্ধ হয়ে গেল। জোনাকির আলো, জ্বল্‌ছে আর নিভ্‌ছে; তারই তালে তালে ঝিল্লি ডেকে উঠ্‌ছে, যেন—আলোকপরীদের পায়ের নূপুরের শব্দ!

মালিনী একটি রক্তকরবীর গুচ্ছ নিয়ে আপনার ঘরে বসে ছিল। মাঝে মাঝে সেটিকে চোখে কপালে বুলিয়ে নিচ্ছিল। বাইরের অন্ধকারে কে ডাক্‌ল—দিদি...

মালিনী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌ল—আয় বোন্ আয়—তোরই অপেক্ষা করে আমি বসে আছি।

চাঁপা মালিনীকে প্রণাম কর্‌ল।

চাঁপার মুখখানি আলোর দিকে ঘুরিয়ে এনে মালিনী বল্‌ল—হাঁ, ঐ হাসিটিই আমি দেখ্‌তে চেয়েছিলাম তোর মুখে...আশীর্বাদ করি ওটি অম্‌নিই লেগে থাক্ তোর মুখে চিরদিন।

চাঁপা বল্‌লে—তোমার মালা, আমার এই হাসি ফিরিয়ে এনে দিয়েছে…এর জন্তে—

চাঁপার মুখে হাত চাপা দিয়ে মালিনী বল্‌ল—থাক্‌ থাক্‌। আমার আর ওসব শোনাতে হবে না। এখন তোর পুজোর কথা বল্‌।

চাঁপা বল্‌লে—তোমার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে আমি মালাটিকে যত্ন করে পদ্মপাতা দিয়ে ঢেকে রাখ্‌লাম, সন্ধ্যাবেলা পূজো করব বলে। তোমার মালায় একটি ফুল ও শুখিয়ে যায় নি! …কি দিয়ে মালা গেঁথেছিলে?

মালিনী বল্‌ল—ও তোর হাতের স্পর্শ পেয়েই শুখায় নি। তারপর—বল্‌।

দিনের আলো যখন একেবারে নিভে গেল, ঠাকুর আমার ঘরে এলেন…তাঁর পা ধুইয়ে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে, আসনে এনে বসালাম। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে, তাঁকে প্রণাম কর্‌তে ভুলে গেলাম…

মালাটি পরিয়ে প্রণাম কর্‌তে ভুলে গেলি?…

হাঁ। কিছুই আর মনে রইল না!…সেই মালাটি তাঁর বুকের দুপাশ দিয়ে নেমে এসে কোলের ওপর লুটিয়ে পড়্‌ল!…

চাঁপার মুখখানি নিজের মুখের কাছে সরিয়ে এনে মালিনী বল্‌ল—কোলের ওপর লুটিয়ে পড়্‌ল?…

হাঁ।—আর সেই যে গোলাপের কুঁড়িটি মালার মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছিলে, সেটি দেখি কখন ফুটে উঠেছে! …

চাঁপার কথার প্রতিধ্বনির মতই মালিনী বল্‌ল—ফুটে উঠেছে ?...

তিনি সেই মালাটি নিজের গলা থেকে খুলে নিয়ে—

মালিনী বল্‌ল—ওকি চাঁপা! কাঁদ্‌ছিস কেন? আয়, আমার বুকের ওপর মাথা রেখে বল্‌।

চাঁপা ভারি আস্তে আস্তে বল্‌ল—আমার গলায় পরিয়ে দিলেন।....

মালিনী তাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে বল্‌ল—তোর গলায় পরিয়ে দিলেন!...তার পর ?

চাঁপা হেসে বল্‌ল—তার পর আর আমি বল্‌তে পারব না...

মালিনী বল্‌ল—তোর সুখের কথা শুধু আমায় শুন্‌তেও দিবি না চাঁপা ?

দুহাত দিয়ে মালিনীর গলা জড়িয়ে, তার কানের ওপর ঠোঁট চেপে, চাঁপা বল্‌ল—তিনি, আমার মুখের ওপর মুখ রাখ্‌লেন।...

* * * *

ফোটাফুলের গন্ধ মেখে দম্‌কা হাওয়া ঘরের ভিতর ছুটে এসে দীপশিখাটিকে ব্যস্ত করে তুল্‌ল।

চাঁপা বল্‌ল—কিন্তু তুমি আমায় ত তোমার কোন কথাই বল্‌লে না ভাই ?

মালিনী হেসে বল্‌ল—যার মাথা নেই তার মাথা ব্যথা!... আমার আবার কথা কি ? আমার কাজ শুধু মালা গাঁথা। পূজোর অধিকার আমার নেই চাঁপা, তাই আমার কথাও কিছু

নেই। কিন্তু তুই রোজ এমনি করে এসে আমার কাছ থেকে মালা নিয়ে যাস্, বড় খুসী হব।

চাঁপা বল্‌ল—না-না। আর দরকার হবে না। এবার আমার হাত ছুটোই তাঁকে বাঁধ্‌তে পারবে...

চাঁপা চলে গেছে। নিরালা ঘরে বসে, আপনার মনে মালিনী বল্‌ল—আর মালা চাই না...চাঁপা বলে গেল, এবার তার হাতদুটিই তাঁকে বাঁধ্‌তে পারবে...ওর হাতদুটি সার্থক হয়ে উঠ্‌ল...কিন্তু আমার এ যে বোঝা হয়ে রইল—এর ভার যে আর বইতে পারি না...পূজোর অধিকার আমার কেড়ে নিলে, কিন্তু কামনা ত মরে গেল না!...সে যে আমার বুক ভরে বেঁচে রইল...তাই আমি এগিয়ে এসেছিলাম, অন্তের পূজোর অর্ঘ্য সাজিয়ে, আপনাকে ভুলিয়ে রাখ্‌বার জন্তে... এও তোমার সহ্য হল না...ঠাকুর আমার, এখানেও পথ আগ্‌লে এসে দাঁড়ালে... 'আর মালা চাই না,' ঐ একটি ইঙ্গিতেই জানিয়ে দিলে—আমাকে প্রয়োজন নেই...কিন্তু আমার যে প্রয়োজন আছে...এ প্রয়োজনের দুঃখ সইব কি করে?...

শিশির

পশ্চিম আকাশে, ধূসর মেঘের আবরণের ভিতর দিয়ে, নির্বাণ-উন্মুখ প্রদীপের ক্ষীণ শিখাটির মত দিনশেষের ম্লান আলো, শ্বেতকরবীর পাপ্‌ড়ির ওপর বারিবিন্দুগুলির সঙ্গে মিশে, লক্ষ চুনী-পান্নার মতই পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়্‌ছে, যেন প্রিয় বিরহিণীর অশ্রুকণা...পূরবী রাগিণীর মীড়ের মত সে আলো, বেণুকুঞ্জে কেঁপে কেঁপে লুটিয়ে পড়্‌ছে! সে আলোক-সঙ্গীত রুদ্ধ ঘরের আগল ভেঙ্গে আমায় বাইরে নিয়ে এল!...

আমার জীর্ণ মলিন বসনখানি, এ কোন অপূর্ব্ব রঙএ রঙিন হয়ে উঠ্‌ল! এ রঙিন আলোকে স্নান করে আমার কি হবে?... এখনি যে অন্ধকারের সমস্ত কালি আমার দেহে মাখা হয়ে যাবে। কালোর বুকেই যে আমার ঠাঁই।—আমার বুকজুড়ান কালো... আমার অনিত্র আঁখির ঘুমপাড়ান অঞ্জন...ঐ ত আমার সব। তবু আজ এই আঁধারসাগরের কূলে দাঁড়িয়ে, আলোর মাধুরী দেখ্‌বার জন্যে আমার চোখ দুটি জলে ভরে উঠ্‌ছে কেন?... মুমূর্ষুর কাণে নবজীবনের আশার বাণী শুনিয়ে প্রকৃতির একি নিষ্ঠুর পরিহাস!...

প্রভাতে, মল্লিকার নির্ম্মাল্যখানি হাতে নিয়ে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালাম, সে কি তীব্র আনন্দের আবেগে আমার হৃদয়খানি মাতাল হয়ে উঠ্‌ল...নব-রবি-কিরণের প্রথম চুম্বনে আমার দেহ যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌ছিল!..

প্রাণপণ শক্তিতে হাতদুখানি তুলে আমার মালাখানি কার গলায় পরিয়ে দিতে গেলাম ?...কার স্নিগ্ধ বাহুবন্ধনে আশ্রয় নেবার রঙ্গে আমার শ্রান্ত মাথাটি ধীরে ধীরে নত হয়ে পড়ছিল !—কে সে ?...

আমার বরণমালা যেখানে এসে পড়ল, সে ত আমার প্রিয়ার পুষ্পপেলব কণ্ঠ নয়—সে যে তড়িৎশিখা !...আমার মাথাটি যেখানে গিয়ে ঠেক্‌ল, সে ত তার স্নেহকোমল বক্ষ নয় ; সে যে বজ্রকঠিন পাষাণ প্রাচীর !...

কোথা হতে দারুণ ঝঞ্ঝা উন্মত্ত আবেগে ছুটে এসে আমার বুকের ওপর আছড়ে পড়ল !...ঐ যে মরণ কলরোল, সহস্র ব্যথিতের বুকভাঙা আর্ত্তনাদ আমার চারিদিকে ধ্বনিত হয়ে উঠছে, ওরই মাঝে কি আমার প্রিয়ার মধুর বাণী লুকান আছে ?...যে দারুণ আঘাতে আমার হৃদয়খানি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, সে কি আমার প্রিয়ার স্পর্শ ?...

কোথায় গেল আমার নব মল্লিকার মালা ?...ঘূর্ণি হাওয়ার আবর্ত্তের সঙ্গে পথের ধূলার মতই কোথায় ভেসে গেছে—কে জানে !...

কোথায় আমার নয়নভুলান আলো ?...চোখ মেলে দেখি,—কালো, কেবলই কালো !...অন্তহীন বিরাট অন্ধকার পৃথিবীর বুক হতে সমস্ত আলোক-লেখা মুছে নিয়েছে !...

আমার জীর্ণ ঘরের দুয়ারখানি যতবার ঝড়ের বিপুল আঘাতে কেঁপে উঠেছে, মনে ভেবেছি—এইবার বুঝি সে এল...

দিনের অন্ধকার কখন রাতের অন্ধকারের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে, জান্‌তে পারিনি! আমার নিরালা ঘরের প্রদীপখানি জ্বালা হয় নি,—কি হবে আলোতে? এ অনন্ত রাত্রির অনন্ত কালি কি আমার একটি প্রদীপে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে?...

এই ত শান্তি...এই ত তৃপ্তি!...এই ত আমার প্রিয়া!... ওগো অসিতা, তোমার ঐ কালো রূপ দিয়ে আমার চোখের আলোর নেশা চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দাও...

*　　　　*　　　　*

কোথা হতে দোয়েলের মিঠে গান ভেসে আস্‌ছে! যেন নিশীথের বিদায়-সঙ্গীত!...আমার খোলা জানালার ভিতর দিয়ে উষার রঙিন বসনাঞ্চলখানি দেখা যাচ্ছে!...

দুয়ার খুলে বাইরে এলাম। আমার কুন্দগাছের ঝাড়ের পাশে, ও কে গো!...আমি যে চিনি ঐ ম্লান হাসির রেখাটিকে... আমি যে চিনি তার ঐ চোখের কোণের অশ্রুকণাগুলিকে...

তার পাশে এসে দাঁড়ালাম। নাড়া পেয়ে কুন্দফুলের রাশি চারি দিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল!

তাকে বল্‌লাম—আমি যে তোমারই প্রতীক্ষায় সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র কাটিয়েছি, বাতাসে তোমার পায়ের ধ্বনি শুনেছি...

বেদনামাখান চোখদুটি আমার মুখের ওপর তুলে সে বল্‌ল—আমিও যে তোমারই প্রতীক্ষায় পড়েছিলাম—তোমারই আঙিনায় ...তুমি দুয়ার যে রুদ্ধ রেখেছিলে...

আমি বল্‌লাম—ওগো এবার এস, দেখ সকল বন্ধন খুলে দিয়েছি।

কি করুণ হাসি তার মুখের ওপর ফুটে উঠ্‌ল।...হাতদুটি প্রভাত-তপনের দিকে বাড়িয়ে সে বল্‌ল—আর ত সময় নেই, এবার আমায় যেতে হবে—আমি যে শিশির...

তাঁর অমল শুভ্র আঁচলখানির স্পর্শ নেবার জন্যে হাত বাড়ালাম—কোথায় আমার শিশির ?

বাতায়ন

ঘরে ঢুকতেই বাসন্তী বলে উঠল—জানিস্ মলিনা, কাল সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার মাথা নেড়ে গেছে?

এই কথাটা অনেক দিন আগে থেকে শোন্‌বার জন্তে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও, আমার বুকের ভিতর কেমন করে উঠল! এক-খানা পাখা হাতে নিয়ে বাসন্তীর কাছে সরে এসে বস্‌লাম।

সে বল্‌ল—ওকি? তুইও যে আবার মুখখানা অন্ধকার করে রইলি! কি জালা! কাল বাড়ীশুদ্ধ লোকের কাণ্ড দেখে হেসেই মারা যাচ্ছিলাম আর কি! ডাক্তার আমার ঘর থেকে বেরুতেই বড় মামা তার হাত ধরে বল্‌লেন—কি রকম দেখ্‌লেন ডাক্তার বাবু?—কিছু আশা...

আমার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে শুনে, আমি বালিশের আড়াল থেকে দেখ্‌লাম, ডাক্তার আঙ্গুল দিয়ে ঘড়ির চেন্‌টা নাড়্‌তে নাড়্‌তে তারই সঙ্গে একটুখানি মাথাটিও নাড়্‌লেন...তাতেই বড় মামার অসমাপ্ত কথাটি সমাপ্ত হল—নেই!...

'আশা নেই', যেন একটা ভারি অসম্ভব কথা,—এমন কথা যেন আর কেউ কখনও শোনে নি!...

ডাক্তারের মাথা নাড়া দেখে বড় মামা ত সেইখানেই বসে পড়্‌লেন। তুই যদি আসতিস্ কাল, তাহলে ওদের কাণ্ড দেখে খুব খুসী হতিস্।

আমি বল্‌লাম—হাঁ বাসন্তী, খুশী হবার মতই ব্যাপারটি বটে।

পা দিয়ে শালখানা সরিয়ে ফেলে বাসন্তী বলে উঠ্‌ল—কেন নয়? যে জিনিসটিকে পাবার জন্তে এই একটি মাত্র ঘরে বন্ধ থেকে বছরের পর বছর সাধনা করে আস্‌ছি, সেটি এবার পাব... সময় হয়েছে!...একি আমার কম আনন্দের কথা? আমি বাঁচ্‌ব রে বাঁচ্‌ব—ররে বাঁচ্‌ব—এই সোজা কথাটাকে তোরা যে কেন বুঝ্‌তে পারিস্‌ না, তাই ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই!...

একি আমার যেমন তেমন সাধনা?...আমার সেই উনিশ বছর বয়সের চেহারা তোর মনে আছে নলিনী? না থাকে, ঐ ফটোখানা হাতে নিয়ে দেখ্‌, বুঝ্‌তে পার্‌বি।

বিধাতাকে দৈহিক লাবণ্যের এক কণাও ফাঁকি দিই নি—বরং কিছু বেশী দিয়েছি। ফটোতে ঐ যে দেখ্‌ছিস্‌ কোঁকড়ান চুল একরাশ, ও আমারই নিজের হাতে তৈরি করা। এই মাথার ওপরই ঐ চুলগুলি ছিল একদিন...ঐ চুলগুলি হাতে ধরে সে—আঃ কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!

নলিনী তুই ঐ আর্‌সিখানা একবার আমার মুখের সাম্‌নে ধর্‌বি ভাই? আমি একবার দেখ্‌তে চাই নিজের ছবি—অমনি 'না' বলা হল ওরে বাপু, যখন এই মাথার বালিশটাকে দুহাত দিয়ে চেপে শ্বাস টান্‌তে থাকি; একটুখানি হাওয়া বুকের ভিতর পূরে নেবার জন্তে আমার প্রতি লোমকূপটিও ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু পারি না, কিছুতে পারি না...অসহ্য ব্যথার সমস্ত

শরীর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। সে কষ্ট সহ্য করবার চেয়ে কি আমার আয়সিতে মুখ দেখা বেশী শক্ত?...

আচ্ছা নলিনী, আজকাল কি ঝড় হয়? হয়? কি আশ্চর্য্য! আমি কিন্তু কিচ্ছুই বুঝতে পারি না! যদি অর এক বিন্দুও আমার এই বুকটার ওপর এসে লাগে, তা হলে বোধ হয় আমি বেঁচে যাই...

খুলে দে নলিনী, খুলে দে সমস্ত। না, ও পর্দাটাকেও ছিঁড়ে ফেল্—কোথাও যেন আর কোন-বাধা না থাকে...

হাঁ, কি বলছিলাম? মনে পড়েছে। ঐ বড়মামী, যেন কিরকম মানুষ! ডাক্তার বলেন, খুলে রাখতে সমস্ত দরজা জানালা, উনি কিন্তু কিছুতেই রাজী নন্...আমি সে দিন রেগে বললাম—তুমি কি আমায় ঘরে দম বন্ধ করে মেরে ফেলতে চাও? তিনি বললেন—তুই মরবি একেবারে পণ করে বসেছিস্। তাই হোক। তোর মরণ দিয়েই আমার এ ঘর ভরে উঠুক...তারপর আমায় বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—মর্, আমার বুকের ওপরই মর্, এ আমার সইবে; কিন্তু বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে তোর গলা বসে যাবে, এ আমি সইতে পারব না...

বাসন্তী একবার ওঠবার চেষ্টা করেই বুকের ওপর দুটি হাত চেপে স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বলল—এখন কি অন্ধকার হয়ে গেছে নলিনী?

আমি বললাম—না, সূর্য্যাস্ত হয়ে গেছে। গোধূলির রঙে চারদিক ভরে উঠেছে।

বাসন্তী বল্‌ল—কৈ নলিনী, কোথায় গোধূলির রঙ?—আমি আর কিছুই দেখ্‌তে পাই না, চোখের দৃষ্টি একেবারেই গেছে... তোর মনে পড়ে, এই ঘর থেকে আমরা দুজনে গির্জ্জের ঘড়িতে ক-টা বেজে ক-মিনিট হয়েছে বল্‌বার চেষ্টা কর্‌তাম?—তুই পার্‌তিস না। আমি কিন্তু একবার দেখেই বলে দিতাম। আর আজ, আলো অন্ধকারের পার্থক্য বুঝ্‌তে পারি না, সেই চোখে... আচ্ছা নলিনী, ঐ সাম্‌নের বাড়ীটার ওপর ও কি গোধূলির আলো পড়েছে?

আমি বল্‌লাম—হ্যাঁ খুব বেশী করেই পড়েছে! ওটা যে একেবারে পশ্চিমমুখো।

বাসন্তী বল্‌ল—দোতলার সেই জানালাটাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্?

আমি বল্‌লাম—কোন্ জানালা? ওখানে ত পাঁচটি আছে।

বাসন্তী বল্‌ল—মাঝেরটি; যেটি ঠিক আমার জানালার সঙ্গে মুখোমুখি করে আছে...

আমি দেখে বল্‌লাম—পাচ্ছি। আর ঘরের ভিতর একটি ছোট ছেলে একটা কাঠের ঘোড়ার চড়ে তাতে চাবুক মার্‌ছে।

বাসন্তী ব্যগ্র হয়ে বল্‌ল—তুই দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ মণ্টুকে?... আমারও বড় ওকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস হয় না। সেদিন ও আমাকে দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠে ছিল...

আমি জিগ্‌গেস কর্‌লাম—ও কার ছেলে বাসন্তী?

সে বল্‌ল—জ্যোতির।

আমি বল্‌লাম—জ্যোতি কে ?

বাসন্তী আমার সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বল্‌ল—যখন বাইরের আলো একেবারে নিভে যাবে আমায় জানাস্‌ ! আর এখন আমায় ঐ পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে বালিশটা আমার পিঠে দিয়ে রাখ্‌।

.. আমি বসে আছি আমার মুমূর্ষু বন্ধুটিকে নিয়ে। মৃত্যুর দূত ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের নিশ্বাস পতনের শব্দ যেন ঘরের ভিতরকার নীরবতায় বেজে উঠ্‌ছে ! তারা বুঝি আরো এগিয়ে এল !...

হঠাৎ বাসন্তী বলে উঠ্‌ল—এইবার হয়ত সময় হয়েছে !... দেখ্‌ত নলিনী, সাম্‌নের বাড়ীর সেই ঘরটিতে কি আলো জ্বালা হয়েছে ?

আমি দেখ্‌লাম—একটি বাতিদান হাতে নিয়ে কে একজন সেই ঘরে এল !...বল্‌লাম—হাঁ বাসন্তী, এইবার হল।

আমার একখানা হাত ব্যাকুল ভাবে চেপে ধরে বাসন্তী বল্‌ল—হয়েছে !...এসেছে সে ?...দেখ্‌ একবার ভাল করে ; তোর হয়ত ভুল হতে পারে।

আমি বল্‌লাম—না, বেশ স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছি তাকে। এই বার সে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল ! মেঘের আড়াল থেকে যেমন করে সূর্য্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়ে, তেম্‌নি করে, ঘরের ভিতরকার আলো, তার দেহের চারপাশের ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আস্‌ছে !

বাসন্তী সেই দিক লক্ষ্য করে হাতদুটি বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ল—জ্যোতি, আমার জ্যোতি! তোমার ঐ আলোটুকুর দিকে তাকিয়ে আমার সকল দুঃখ ভুলে ছিলাম। আমার এই জীর্ণ দেহটির ওপর তোমার স্নিগ্ধ রশ্মিরেখার চুম্বন বড় মিষ্টি লেগেছিল... আজ খেয়াঘাটের শেষ পৈঠায় দাঁড়িয়ে তোমার কথা ভাব্‌ছি.... যদি পারি, এই ভাবনাটুকু বুকে নিয়ে পার হয়ে যাব—নলিনী, এখনও কি সে ঐ খানে দাঁড়িয়ে আছে?

আমি বল্‌লাম—হাঁ ভাই, সে ঠিক তেমনিই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

বাসন্তী বল্‌ল—এইবার আমার ঘরের আলো নিভিয়ে দে। নইলে, যতক্ষণ আমার এই বিছানাটাকে ও দেখ্‌তে পাবে ততক্ষণ ও ওখান থেকে নড়বে না...আর নয়—দে আলো নিভিয়ে।

আমি বাসন্তীর কথামত আলো নিভিয়ে দিলাম, কিন্তু জানালার ওপর হতে সেই ছায়ামূর্ত্তিটি মিলিয়ে গেল না!...আমি সে কথা আর বাসন্তীকে বল্‌লাম না।

বাসন্তী আমায় কাছে টেনে নিয়ে বল্‌ল—আমি মরে গেলে, এই আঙ্‌টিটা খুলে নিয়ে ওকে দিয়ে বলিস্‌—তুমি বাসন্তীকে যে সম্পদ দিয়ে ছিলে, খুব আদরেই তা বুকে করে রেখে ছিল সে। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত তোমায় সে ভোলে নি—কি থাক্‌। তাকে আর কিছুই বলিস্‌ নি—শুধুই এটা ফিরিয়ে দিস্‌...এই বার আমায় একটু একা থাকতে দে নলিনী।

আমি বল্‌লাম—আর একটু তোর কাছে থাকি বাসন্তী!

অস্থির হয়ে সে বলে উঠ্‌ল—না—না এখন আর আমায় বিরক্ত করিস্‌ নি…

আমি—দরজার বাইরে এসে বস্‌লাম। বাসন্তী আপনার মনে বল্‌তে লাগ্‌ল—জ্যোতি—জ্যোতি, তোমার ঐ প্রদীপের আলোটুকুও যদি একবার দেখ্‌তে পেতাম…

জলছবি

মাটির বুকে, অল্প একটুখানি ঠাঁই জুড়ে পড়ে থাকে জলাশয়, যেন সকলের কাজে আস্‌বার জন্তেই। তার নিজের যেন কিছুই নেই—অভাব ও না, ইচ্ছেও না!

রোদের তাপে জল শুখিয়ে গিয়ে জলাশয়ের বুকের মাটি যখন ফেটে যায়, তখন তার জন্তে কাঁদে মানুষ। আবার বর্ষায় যখন তার কূল ছাপিয়ে ওঠে, তখন তার জন্তে আনন্দ করেও মানুষ!

বসন্ত দিনে, ঐ নিথর জলের বুকে রঙিন ছায়া ফেলে, পাতা-ভরা গাছের সারি, ধীর বাতাসে দোল খেতে থাকে; দুপুর বেলায় স্তব্ধতা ঘুচিয়ে দস্যি ছেলের দল, তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে অস্থির করে তুল্‌তে চায়; তবু এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ করে না সে, যাতে মনে হতে পারে 'অনুভূতি' বলে একটা কিছু ওর আছে। এমন কি শান্ত সন্ধ্যায়, কর্মশ্রান্ত দেহলতাটি ডুবিয়ে দিয়ে গ্রামের বধূটি যখন অবসাদ মেটায়, কিম্বা প্রিয়সখীর কাণে কাণে, সব চেয়ে গোপন কথাটি বলে, বুকের নীচে কলসী রেখে গভীর জলের দিকে এগিয়ে যায়—তখন ও না!...পায়ের ধাক্কা লেগে যে জলটুকু ছল্‌কে ওঠে, সে যেন জলের শব্দ নয়; ঐ মেয়েটির রুদ্ধ হাসিরই প্রতিধ্বনি···সে থাকে স্তব্ধ। তার চারপাশের মাটির সীমানার মতই।

কিন্তু ওর অর্থ কি? রক্তরাঙা পাপড়িগুলি মেলে দিয়ে, নিবিড় কালো বুকের তলা হতে ধীরে ধীরে ঐ যে বেরিয়ে এল! ...ও কোন্ বেদনার ভাষা?...আর তারই পাশে ফুটে আছে শান্তি ভরা ও কার শুভ্রহাসির শ্বেতশতদল!...

২

পাষাণপুরীর প্রাচীরঘেরা আঙ্গিনায়, হিমানীর বুকে, পাষাণের মতই অচল হয়ে, অচেতনে ঘুমিয়ে ছিল নির্ঝরিণী। জমাট কুয়াসার আবরণ সরিয়ে দিয়ে রবির আলো, মোহনস্পর্শখানি তার সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে দিল!

পাখীর গানে আকাশ ভরে গেছে। সবুজ ওড়্নার ভিতর হতে মুকুলগুলি তাদের অমলিন মুখ বাড়িয়ে দিল। দম্কা হাওয়া নির্ঝরিণীর গায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে তার কাণে কাণে কি বলে গেল কে জানে! চম্কে উঠে, হাজার হাত উঁচু প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে পড়ে, নির্ঝরিণী বল্ল—চল্—চল্—চল্...

মাটি বুক পেতে তাকে ধর্‌তে গিয়ে বল্‌ল—ওকি? কোথা যাও? ওগো তটিনী একটু দাঁড়াও...

মাটিকে হুপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তটিনী হেসে উঠ্‌ল—খল্ খল্...খল্...তার হাসির তালে তালে শত শত উপল খণ্ড, নাচ্‌তে নাচ্‌তে আনন্দে মাতাল হয়ে ছুটে চল্‌ল...বাধা বাঁধন ভাঙ্গল।

মাটি তাকে ধরে রাখ্‌তে পার্‌ল না; কিন্তু তার গলায় যে

ঐশ্বর্য্যের মালাগাছি পরিয়ে দিল, যমুনার কালো বুকে তাজমহলের ছায়াছবিখানিতে সেই ইতিহাসই ত লেখা আছে!...

এমন কত ছবি তার বুকে আঁকা হয়ে গেল। কত স্পর্শ তাকে আকুল করে, পাগল করে দিল। সে চল্‌ল বিরামহারা, হাসির সুরে নাচের তাল মিলিয়ে।

তরুণ রবির সোণার আলো কখন রুদ্রের দীপ্ত চোখের মত জ্বলে উঠেছে! বিশ্ব চরাচর নিশ্বাস রুদ্ধ করে পড়ে আছে যেন চেতনাহীন! বাঁকের মুখে, বনের শ্যামল ছায়াটুকুর কাছে এসে তটিনীর গতি যেন একটু শিথিল হয়ে এল! যেন আর সে বইতে পারে না...ঐখানটায় একটুখানি জুড়িয়ে নিতে চায় সে।

ছোট ছোট ঢেউগুলি আনন্দের গান ভুলে, ক্লান্তিভরে কূলে এসে লুটিয়ে পড়্‌ছে...বাতাস ও যেন মরে গেছে! কিন্তু তটিনীর থামা হল না! সে ছুট্‌ল আপনার চলার বেগে আবর্ত্তের সৃষ্টি কর্‌তে কর্‌তে।

মাটি বারে বারে তার কোমল বুকখানি পেতে দিয়ে বলে—ওগো একটু দাঁড়াও...আমার বুকেই যে তোমার ঠাঁই।

আঘাতে আঘাতে তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে হেসে তটিনী বলে—আমার ঠাঁই?—নাই নাই...সে কোথাও নাই।

তাকে চল্‌তে হবে। কিন্তু কোথায়? এ যে বিরামবিহীন চলা! দিনের পর দিন চলে যায়, তবু এ চলা ফুরায় না যে!

কিন্তু ফুরাল। চলা তার থাম্‌ল। হাসি গান তার থাম্‌ল। পথের শেষে এসে পৌছল যখন সে সাগরে।

আর কোথাও যাবার নেই। পথ নেই। পাখী তাকে গান শুনিয়ে যায় না। বাতাস তেমনি করে স্নিগ্ধস্পর্শে তাকে আকুল করে তোলে না। বারে বারে মাটিও তাকে আর বুক পেতে বলে না—ওগো দাঁড়াও...একটু থাম।

তার প্রাণের সমস্ত হাসি শুখিয়ে গিয়ে জেগে উঠ্‌ল—কান্না। কিন্তু চলার দুর্দ্দমনীয় বেগ মরে গেল না! পথ নেই, তাই সে শুধু আপনারই বুকে পড়ে আর ওঠে...আর কারো স্পর্শ সে পায় না, কিন্তু তার বুকে ভরা আছে সেই স্পর্শের স্মৃতি।

এই সাগর তার 'মরণ'। এইখানে এসে তার জেগে কাটাবার পালা। কান্নাই তার কাজ। এই জন্তেই ত সাগরের রঙ নীল, মরণেরই রূপ—রক্তের চিহ্ন মাত্র নেই।

হাজার প্রাণের দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলে ভরা যে তটিনীর বুক। সবাই যে তার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্তি পেতে এসেছিল ছুটে। সবাই যে তার বুকে বোঝা নামিয়ে দিয়ে নিজেদের বুক হাল্‌কা করে নিয়েছে; কিন্তু তার বোঝা যে কেউ নামিয়ে নিল না...এত প্রাণের ব্যথার বোঝা বয়ে, হাসি তার মুখে ফোটে কি করে?

ও ভার ত কোথাও নামাবার নয়। তাই প্রাণপণে সবগুলিকেই সে আঁকড়ে ধরে রইল।

এ অনন্ত মরণে ঐ ত তার একমাত্র সান্ত্বনা। ঐ সান্ত্বনা কে বুকে চেপে তার সকল কান্নার মধ্যেও সে বলে—হে ঠাকুর, তোমার নমস্কার। ভার আমায় দিয়েছ, সেই সঙ্গে বইবার শক্তিও

দিয়েছ আমায়, নইলে আমাকেই বেছে নিলে কেন ?...এ আমার মহা-সৌভাগ্য ! আর কোন সংশয় নেই। আমি বুঝেছি। যে বন্ধনকে অসহ্য মনে হয়েছিল, সেই বন্ধনেই আমার মুক্তি লুকিয়েছিল.আমি দেখিনি !...যাকে মুক্তি ভেবে বন্ধনকে ছিঁড়ে এসেছি, সে মুক্তি মরণেরই রূপান্তর ।...

কান্নার আবেগে মাটির কোলে আশ্রয় নিতে গিয়ে সে দেখ্‌ল—মাটি মরে গেছে ! পড়ে আছে তার কঙ্কাল...সে সরসতা নাই...সে হাসিও নাই !

৩

চোখজিনিসটা যেন বাতায়ন। পাঁজরঘেরা রুদ্ধকারার অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসে, প্রাণ সময় সময় এইখান থেকে আপনাকে বাইরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে নিতে চায়।

কিন্তু সে ত সহজ নয়। কারণ এখান থেকে চীৎকার করে ত বলা চলে না—সব কথাই নীরবে কইতে হয়। তাই তার খবর সবাই পায় না।

মানুষের স্বভাব কাণ দিয়ে জানা, চোখ দিয়ে ত নয়। তা ছাড়া সব সময় ওটা .সকলের খোলাও থাকে না। তাই কোন শ্রান্তপ্রাণ যখন এই বাতায়নতলে নীরবে অপেক্ষা করে থাকে, তখন তার সে অপেক্ষার একটা সীমাও সাধারণত থাকে না।—হয়ত কারো সাড়া পায়ও না সে জীবনে। দাঁড়িয়ে থাকাই সার হয়—দরদীর খবর মেলে না।

কিন্তু যে মুহূর্তে পায়, সে মুহূর্তটির বর্ণনা কি দিয়ে হবে?—কে পারবে?

ঐ দুটি চোখে চোখে কি বলা হয়ে যায়? ওর সুখের কাছে বিশ্বের আনন্দ যে ম্লান হয়ে যায়! ওর বেদনার কাছে শক্ত বজ্রাঘাত যে ফুলের আঘাত বলে মনে হয়।

ঐ দুটি বাতায়ন হতে প্রাণ যখন বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে বলে—ওগো তুমি ছিলে এই মাটির পৃথিবীতেই!...একি তোমায় আমি দেখ্‌ছি!—তখন ঐ দুটি কথার আড়ালে আরো কি লুকিয়ে রাখে ওরা?...

ধীরে ধীরে বাতায়ন বন্ধ হয়ে আসে! প্রাণ যেন গলে গিয়ে জল হয়ে বেরিয়ে এসে মাটিতে পড়ে হারিয়ে যায়!...তারপর কি রইল বাকি?...আলো না অন্ধকার?...

৪

তাপদগ্ধ মাটি, আপনারই গ্লানিরধুলার মলিন শয্যা হতে, নীল আকাশের গায়ে পারিজাতের মত স্নিগ্ধ জ্যোতিলেখার দিকে স্থির নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে—কি করে ওর স্পর্শ পাওয়া যায়? ওখানে গিয়ে পৌঁছন যায় কি?—ওর স্পর্শে যে তার সমস্ত কলুষ শুভ্র সুন্দর হয়ে উঠ্‌বে।...

এই কথাটি ভেবে ভেবে বুকে তার যে কান্না ওঠে, তা বাইরের হাওয়ায় ভেসে যায় না—প্রকাশ পায় না। আপনার বুকেই জমাট বেঁধে অচল হয়ে পড়ে থাকে।

তার বাইরের সমস্ত রূপ-হাসি-গানের নীচে, ঐ জমাটবাঁধা

কান্না, প্রচণ্ড তেজে জ্বলতে থাকে অহরহঃ—সে নেভে না, তাই তার চোখে ঘুম নেই।

জ্যোতিলেখা নির্ম্মাল্যের ডালি সাজিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। করুণায় তার বুক ভরে যায়। বলে—ওগো মাটি, আমি যে তোমার কোন কাজেই এলাম না !.. তোমার দীর্ঘশ্বাস যে আগুনের চেয়েও শুষ্ক! তাই তোমার কাছে গিয়ে পৌছতে পারি না·· পুড়ে মরে যাই।

মাটি বলে—কিন্তু পেতেই· যে হবে তোমায়...নইলে আমার জলেশ্বরাই সার হবে...জুড়োতেই যে হবে আমায়...

জ্যোতিলেখা বলে—কি করে তা হবে ? তুমি যে রেখেছ নিজেকে মরণজাল দিয়ে ঘিরে !...

মাটি বলে—তবে আমিই যাব তোমার কাছে !...

উঠ্‌ল মাটি !...জমাট-বাঁধা কান্না কালবৈশাখীর দুর্ন্নিবার আবেগ নিয়ে, ধূলায় ধূলায় নির্ম্মল আকাশকে মলিন করে, বজ্র-গম্ভীর চীৎকারে দিক্ কাঁপিয়ে, তড়িৎ অসির আঘাতে অন্ধকারের বুক চিরে চিরে ছুট্‌ল মাটি !—জাগ্‌ল কান্না—চাই-চাই-চাই...

কোথায় সে ? কোন্ অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে আছে সে ? খোঁজ তাকে, বার কর তাকে !. একেবারে টেনে এনে আপনার তপ্ত মরুবক্ষে চেপে ধর—শান্তি-হোক !...

আরম্ভ হল খোঁজা ! ঘূর্ণিহাওয়ার পাকে পাকে নিষ্পেষিত হয়ে তরু-গুল্ম-লতা লুটিয়ে পড়ল ! বনস্পতির পাতাছাওয়া রঙিন আস্তরণ গেল উড়ে ! তটিনীর জলরাশি সীমা ছাড়িয়ে উঠে এল

তীরের ওপর! ভীত ত্রস্ত জীব নীড় ছেড়ে নেমে এল বাইরে—অনাবৃত আকাশের নীচে!...

কোথায় সে? আরো কত দূর? সূর্য্য কখন মেঘের আড়াল হতে নীলসাগরের ক্ষিপ্ত অতল জলের তলে নেমে গেছে! বাতাস কেঁদে বল্‌ছে—নাই-নাই সে নাই...দিনের খোঁজা বৃথা... এ আকাশে এ পৃথিবীতে যা আছে তা শুধুই শূন্যতা...

ক্লান্তি ভরে মাটি লুটিয়ে পড়্‌ল মাটিরশয্যায়। বর্ষণ নাম্‌ল! এ যেন তারই দেহ মনের অবসাদ গলে গিয়ে ঝরে পড়ছে!...

নিশুতি রাত্রি। ঝিল্লি ডাকে না। গাছের শাখাও নড়ে না! শুধু তার ভিজে পাতা হতে বিন্দু বিন্দু জলধারা ঝরে ঝরে পড়্‌ছে!...

হঠাৎ বাতাস নিশ্বাস ফেলে বলে উঠ্‌ল—ওগো মাটি, বুঝি খোঁজা তোমার সার্থক হয়েছে। চোখ মেলে দেখ—ঐ ত সে তোমার বুকের ওপর!...

মাটি দেখ্‌ল—চোখের জল ঝরে ঝরে তার বুকের যেখানে জমা হয়ে রয়েছে, তারই মধ্যে আঁকা আছে,—ও কার ছবি?...

মাটি বল্‌ল—এই কি পাওয়া?...কিন্তু আমার যে আর সে তৃষ্ণা নাই...এ পাওয়া যে নাপাওয়ারই মত সমান বেদনার—

মাটি পড়ে রইল নিশ্চল নির্ব্বাক!...জ্যোতির্লেখা তেমনি করেই তাকিয়ে রইল তার দিকে...বাতাস কেঁদে ফির্‌ছে—বৃথা—বৃথা, সব বৃথা...

মা

নবৌ বল্‌লেন—তা যা ই বল দিদি, আমাদের মুক্তি ও কিছু
ফেল্‌বার-মেয়ে নয়। ওর মুখের দিকে তাকালে চোখ জুড়োয়,
ওর কথা শুন্‌লে বুক জুড়োয়। ঐ একরত্তি মেয়ের মধ্যে যে
কতখানি থাক্‌তে পারে, তা ওকে যে না দেখেছে সে ভাব্‌তেই
পার্‌বে না।

—থাম্‌লো, থাম্। কথায় বলে—'ভাত ছড়ালে কাকের
অভাব?' মুক্তি যে ভাল মেয়ে, গুণের মেয়ে, সে কথা ত আর
কেউ অস্বীকার কর্‌ছে না; কিন্তু ওতে আশ্চর্য্য হবার এমন
আছে কি? ভাল হওয়াই ত ওর পক্ষে স্বাভাবিক। সব মেয়ে-
কেই ত ভাল হতেই হয়,—নইলে যে অন্য গতি নেই। কিন্তু
যে মানুষটা ইচ্ছে কর্‌লে মুক্তির মত কত শত দুপায়ে এনে জড়ো
কর্‌তে পার্‌ত, সে যে এমন করে ওকেই সোণার চোখে দেখ্‌বে,
সেইটেই কি সব চেয়ে আশ্চর্য্যের নয়? কতখানি তার তেজ
তার বুকের পাটা একবার ভাব্‌ত নবৌ!—তার বাপ্ বল্‌লেন—
আমাদের ঘরে বিয়ে কর্‌লে বৌকে তিনি ঘরে নেবেন না।
তাছাড়া ওরই সঙ্গে আরো একটা জিনিস যে জড়িয়ে ছিল, 'সমাজ'
তা ও তিনি দেখিয়ে দিলেন। ছেলে উত্তর দিল—বাবা, মানুষের
সব চেয়ে বড় স্বাধীনতা এবং সব চেয়ে সুখের হচ্ছে, আপনার
জীবনের সাথীটিকে খুঁজে নেওয়া। সমাজ যদি এর অন্তরায়

হয়, তা হলে আমাকে এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে, যেখান থেকে আমার আনন্দকে পাওয়া সহজ হবে।

বাপ্ বল্‌লেন—অর্থাৎ স্বার্থ তোমার বজায় রাখ্‌বেই ?

ছেলে বল্‌ল—আমরা সবাই ওটা বজায় রাখ্‌তে চাই বাবা।

বাপ্ বল্‌লেন—বেশ, তাহলে আমার স্বার্থও বজায় রাখি আমি। আমার বিষয়ের একটা কুটোর ওপর ও তোমার আর অধিকার রইল না।

ছেলে বল্‌ল—এই তোমার পা ছুঁয়ে শপথ কর্‌লাম, কোন দিন ওতে লোভ দেখাব না।—তোমারই মুখে শুনেছি, যখন তুমি প্রথম জগতে নেমেছিলে তখন তোমার সহায় কেউ ছিল না—তোমার সম্বলও কিছুই ছিল না। আমিও ত তোমারই ছেলে, যেমন করে তুমি চলে এসেছ তোমার পথ তৈরি করে নিয়ে,—তেমনি করে আমিও চলে যাব।...এ সব কথা কি শুধু 'কথাই' নবৌ ?—মুক্তি পোড়ারমুখী, তুই ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি শুন্‌ছিস্ না ?

—বাঃ কি আবার শুন্‌লাম ? আমি ত তোমার পানটা সেজে নিয়ে এই মাত্র এখানে এসে দাঁড়িয়েছি !

—তা কাঁদ্‌ছিস্ কেন ?

—বা রে ! কৈ কাঁদ্‌ছি ?

—ঐ ত তোর চোখে জল !

—বেশ কর্‌ছি যাও...শুধু শুধু সবাই আমায় বক্‌বে...এই রইল তোমার পান...আর কক্‌খন সেজে দেব না আমি...

—দেখ একবার মেয়ের রকম!...শোন্, পালাচ্ছিস্ কোথায়?

—ও বুঝ্‌তে পেরেছে দিদি। দেখ্‌লে কি করে ও এখান থেকে চলে গেল? চোখের জলটাকে ঢাক্‌তে গিয়ে, তাকে যেন আরো টেনে বার করে আন্‌ছিল! ওর জন্যে হিরণ যে কতখানি দুঃখকে মাথায় করে নিতে চলেছে, সেই কথা ভেবে ওর বুক ফেটে যাচ্ছে...

হাঁ, তা সত্যি। ওর বুক ফেটেই যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখে নয় গো দুঃখে নয়। একি ওর কম সৌভাগ্য? হিরণ শুধু ওরই জন্যে এতটা কর্‌ছে এই কথাটা ভেবে সুখে ও কাঁদ্‌ছে। এতে ওর দুঃখ কোথায়? ছেলেবেলাকার কথা কি ভুলে গেলি নবৌ? যদি তোর জন্যে এমন কেউ কর্‌ত; তাহলে কি তুই শুধু দুফোঁটা চোখের জল ফেলেই থামতিস্? বুকের প্রত্যেক রক্তবিন্দুটিকে আহুতি দিতে তোর কি ইচ্ছে কর্‌ত না?—বেলা গেল যাই। অবিনাশের সঙ্গে ফর্দ্দটা করি গিয়ে। মাঝে ত মাত্র আর একটি দিন বাকি।—আর এই ছেলেটাও আচ্ছা একবগ্‌গা কিন্তু! বল্‌লাম নউই ভাল দিন রয়েছে, সেই দিনেই বিয়ে হলে বেশ হত, তা আর সবুর সইল না! বলে—বিয়েটা কি অপবিত্র কাজ, যে শুভ দিনের জন্যে বসে থাক্‌তে হবে?...কে পার্‌বে বাপু, আজকালকার ছেলেদের সঙ্গে!

—আচ্ছা দিদি, তুমি কি মনে কর, মুক্তিকে ও এমনি চোখেই দেখ্‌বে চিরকাল?

—শোন কথা! তোর ছেলে মানুষী এখনও ঘুচ্‌ল না নবৌ? চিরকালের কথা কে বল্‌তে পারে? আশাই বা অমন কর্‌ব কেন? দুনিয়ার কোন্ জিনিসটা একই ভাবে আছে—? কার বদল হয় নি? মানুষের বুকটাত আর ঘটি কিম্বা বাটি নয়, যে ওর মধ্যে কিছু ধর্‌বার একটা মাত্রা থাক্‌বে? ওতে অনেক ধরে নবৌ। ও থেকে কিছু উপ্‌ছে পড়ে নষ্ট হবার কোন আশা নেই।—এই জন্যেই ত মানুষের সহ্যের সীমা নেই, আনন্দের সীমা নেই, দুঃখের সীমা নেই। যা কিছু আসুক, সবই এতে ধরে।...হিরণ আজ বল্‌ছে, ওর আনন্দ শুধু মুক্তিতেই আছে। তাই ওরই দিকে অমন ব্যাকুল হয়ে এগিয়ে আস্‌ছে; কিন্তু কাল যখন ঐ একটি মুক্তি হতে আরো কত মুক্তি হাত বাড়িয়ে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বার জন্যে ছুটে আস্‌বে তখন ও আবার ভাব্‌বে, ওর আনন্দ শুধু মুক্তিতেই নেই, এদের না পেলে কিছুই হত না, সমস্ত অসম্পূর্ণ থেকে যেত।...এটা হল বিধাতার ভেল্কিবাজী নবৌ, কি করে ওকে ঠেকাবে? আজকের মত মনের ভাব আর দুবছর পরে নিশ্চয়ই হিরণের থাক্‌বে না—মুক্তির ও না। পিছনে এই দুঃখ আছে বলেই ত মানুষকে এমন করে ভালবাসা যায়; কিন্তু ওটা আমরা বড় সহজে ধর্‌তে পারি না, তার কারণ হচ্ছে—ঐ বিধাতার 'যাদু' থাকে আমাদের বুকের ওপর। সে ভাব্‌বার ফুরসুৎ দেয় না আমাদের। তারই দরকারের [illegible] মেটাতে মেটাতে ভুলেই যাই—'আমি' বলে একটা কিছু আছে—ওকি! তুই ও যে কাঁদ্‌ছিস্ নবৌ?...

—আর তোমার চোখ বুঝি শুখ্‌ন দিদি?...

—ওমা! সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখনও ঘরে আলো আলা হয়নি! বসে বসে গল্পই কর্‌ছি! কত কাজ পড়ে রয়েছে, কখন যে কি কর্‌ব তার ঠিক নেই!...

* * * *

অনেক রাত হয়ে গেছে। কিন্তু বিছানায় মেয়েকে না দেখে নবৌ ছাদে এসে দেখ্‌তে পেলেন, অন্ধকারের মধ্যে একটা শাদা মত কি যেন পড়ে রয়েছে! তিনি ভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌তে যাবেন এমন সময় শুন্‌তে পেলেন মুক্তি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌ছে—আমাকে তোমার ভাল লেগেছে?...কিন্তু কি এমন আমার মধ্যে আছে, যার জন্যে সব ছেড়ে চলে আস্‌ছ?...কেন এ কর্‌ছ তুমি?...পিসিমা বল্‌লেন—ইচ্ছে কর্‌লে তুমি আমার চেয়ে কত ভাল মেয়ে পেতে পার্‌তে...তবে শুধু আমাকেই...তোমার নাম হিরণ। হিরণ···হিরণ!...ভারি মিষ্টি নামটি... মনে হয় তুমি একেবারে খাঁটি সোনা...বড় ভয় কর্‌ছে কিন্তু...তুমি যদি দেখ, তুমি আমায় যা ভেবেছিলে আমি তা নই?...তাহলে?...ঐ কথাটা আমায় বড় কষ্ট দিচ্ছে...আমাকে তুমি গড়ে নিও···একটু ইঙ্গিত কর্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌ব আমি...পর্‌শু তোমায় পাব!...আজ আমার প্রণাম নাও···হিরণ...

নবৌ এসে মেয়েকে বুকে তুলে নিলেন। মুক্তি চম্‌কে উঠে বল্‌লে—মা!...

নবৌ বল্লেন—মা বলে আমায় বিদেয় করে দিস্ নি মুক্তি, দূরে ঠেলে রাখিস্ নি…আমিত শুধু তোর মা ই নই, তোর সমস্ত শরীরে মনে যে আমিও আছি মুক্তি… সে কথা ভুলিস্ নি…

আলো ও ছায়া

পূব আকাশের গায়ে রঙের আবির মাখা হতে আরম্ভ হয়ে গেছে। একটি পাখী বড় মিষ্টি করে একবার ডেকে উঠ্‌ল। সেই শব্দে বাতাসের তন্দ্রা টুটে গেল। সে পলাশ, পারুল, অশোক-শাখার ওপর দিয়ে ছুটে এসে, ময়ূরকণ্ঠিরঙে ছোপানো সাড়ির অন্তরালে সুন্দরীর কানে রাঙা চুনীর দুলের মত, ডালিমমুকুলের চোখে, আবেগভরা নিশ্বাস মাখিয়ে তাকে দোলা দিয়ে বল্‌ল—ওঠ মুকুল, জাগো। বড় দেরি হয়ে গেছে! আলো হয়ত এসে দেখ্‌বে তোমার চোখের পাতায় ঘুম এখনও জড়িয়ে রয়েছে—আর দেরি নয়, জাগো।

মুকুল জাগ্‌ল। পাতার ওপরকার শিশিরকণা লেগে তার মুখখানি ধুয়ে গেল।

বাতাস বল্‌ল—তোমার বুকে আমি জীবন ভরে দিলাম! আমার কাজ ফুরাল। তুমি এখন আর মুকুল নও। জগতের সঙ্গে এবার তোমার পরিচয় হোক।—আমি তবে আসি?...

দুলে দুলে ফুল বল্‌ল—এখনি?—না-না আর-একটু থাক। তোমার ঐ পাগল-করা নিশ্বাস আর একবার আমার কপালের ওপর ছোঁয়াও...

বাতাস বল্‌ল—আমার কাজ যে এখনও সব সারা হয়নি।

এখন আলি, কিন্তু আবার তুমি আমায় পাবে। আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় তখনই ভাল করে হবে।

অভিমান করে ফুল বল্‌ল—তবে এখন আমায় কেন জাগালে?....

* * *

সবুজপাতার ওড়্‌না সরিয়ে, প্রভাতআলো ফুলের মুখে চুমা দিয়ে শিশিরকণাগুলি মুছে নিল।

ফুল হেসে বল্‌ল—হাওয়ার চেয়ে তোমার স্পর্শ মিষ্টি! কিন্তু তোমার মুখের দিকে তাকাতে পার্‌ছি না কেন?

আলো বল্‌ল—তাকিও না ফুল, আমায় তুমি সইতে পার্‌বে না।

আলোর দিকে মুখখানি ঘুরিয়ে এনে ফুল বল্‌ল—না তাকিয়েও যে আর থাক্‌তে পার্‌ছি না!...তুমি যে বড় সুন্দর! কিন্তু এ কি! তুমি আমার গায়ে কি মাখিয়ে দিলে?...

আলো বল্‌ল—রূপ।

ফুল বল্‌ল—আর আমার বুকের ভিতর এ কি অনুভব কর্‌ছি?...

আলো বল্‌ল—তৃষ্ণা।

ফুল বল্‌ল—ওগো, দেখ—দেখ! ও যে আমার রূপকে শুখিয়ে দিল!...কিসে পরিত্রাণ পাব?...

আলো বল্‌ল—তৃষ্ণা কখনও মেটে না ফুল, ও শুধু বেড়েই চলে। ও থেকে পরিত্রাণ নেই।

ফুল কেঁদে বল্‌ল—ও তবে আমায় কেন দিলে?...

*   *   *

বড় করুণ সুরে, কে ফুলের চারপাশে ঘুরে ঘুরে গান করে বেড়াতে লাগ্‌ল।—

ফুল তাকে জিগ্‌গেস কর্‌ল—কে তুমি?

সে বল্‌ল—আমি ভ্রমর।

ফুল বল্‌ল—বাতাস আমায় জীবন দিয়েছে, আলো আমার রূপ দিয়েছে—তুমি আমায় কি দিতে এসেছ?

ভ্রমর বল্‌ল—পূর্ণতা। জীবন যখন শ্রান্ত হবে, রূপ যখন ম্লান হয়ে আস্‌বে, তখন তোমার পূর্ণতা প্রকাশ পাবে—তোমারই বুকের রক্তে গড়া ফলে।

ফুল বল্‌ল—আর আমি কি দেব তোমায়, কি আছে আমার?

ভ্রমর বল্‌ল—সুধা। আমার তৃষ্ণার জল।

ফুল বল্‌ল—কিন্তু আলো বলেছে, তৃষ্ণা ত মেট্‌বার নয়?...

ভ্রমর বল্‌ল—ও সইতেও যে বুক ফেটে যায়...

ব্যথিত হয়ে ফুল বল্‌ল—এস—এস, ওগো মেটাও তোমার তৃষ্ণা। যা আছে আমার সবই তোমায় দিলাম।...

*   *   *

দিনের কাজ সারা হল। শূন্যপসরা মাথায় নিয়ে, বেচা-কেনার হিসাবের বোঝা বুকে চাপিয়ে, সবাই হাটের পথ ছেড়ে চলেছে। ক্লান্ত ফুল মাটির কোলে ঢলে পড়্‌ল।

বাতাস তার সর্ব্বাঙ্গে স্নেহ-কোমল স্পর্শ দিয়ে বল্‌ল—তোমায় আমি ভুলিনি ফুল।...

মেঘের আড়াল হতে তারার আলো এসে বল্‌ল—তোমার রূপ অক্ষয় হয়ে রইল আমার বুকে...

ম্লান হেসে ফুল বল্‌ল—আমিও তোমাদের ভুলিনি, কিন্তু সে কোথায়? যাকে আমি আমার সব দিয়েছি।—তাকে দেখ্‌ছি না কেন?...

বাতাস তার কানের ওপর মুখ রেখে বল্‌ল—ঐ তৃষ্ণাই শুধু রইল তোমার বুকে...ঐ অনন্ত তৃষ্ণাই তোমায় আবার নব-জীবনের আলোকের দিকে এগিয়ে নিয়ে আস্‌বে।...

কালোছায়া নিবিড় হয়ে এল...ফুল ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।...

দুই · সন্ধ্যা

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দরজার বাইরে থেকে ছ্যাকড়াগাড়ীর কোচম্যান হেঁকে উঠল—আরো কত দেরি করবে বাবু? আচ্ছা সোয়ারি পেয়েছি!

ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনের মাঝখানে এসে, মার গলা জড়িয়ে মেয়ে কেঁদে উঠল—আমি যাব না···

মেয়ের মাথায় চুমা দিয়ে, কান্নায় ভেজা গলায় একটুখানি রাগের আভাষ এনে মা বললেন—শোন একবার মেয়ের অলক্ষণে কথা!···

মার বুকে মুখ টিপে তবু মেয়ে কাঁদল—না—না—না...

সেই অস্ফুট বুকফাটা কান্নায় মার সকল ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। মেয়েকে বুকে চেপে তিনিও কেঁদে উঠলেন।

সেজপিসী রেগে বললেন—যেমনি মা তেমনি মেয়ে! বলি তুই কার ঘর করতে যাবি না?...

মা ও মেয়ের কান্না থামল। লালচেলীর ঘোমটার ভিতর দিয়ে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়ে গাড়ীতে এসে বসল। কোচমান ঝিলমিলি উঠিয়ে দিল। অন্ধকার কোণে বসে মেয়ে বলল—মাগো একটুখানি ফাঁক রাখতে বলনা...তোমায় যে দেখতে পাচ্ছি না!...

তার এ কান্না কারো কানে এসে পৌঁছাল না। গাড়ীর চাকার শব্দে ডুবে গেল।...

* * *

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। জানালার ফাঁক দিয়ে জলের ঝাপ্‌টা এসে ঘরের অনেকখানি ভিজে গেছে। মাটির ওপর বসে, একটুক্‌রো বালির-কাগজে লেখা চিঠি কোলের ওপর মেলে ধরে, বার বার করে একই কথা মা পড়্‌ছিলেন :—

'মাগো, এখানে আর কিছুতেই থাক্‌তে ইচ্ছে করে না··· আবার কবে আমায় তুমি নিয়ে যাবে মা?...মা—মা, তোমায় কতদিন দেখিনি...'

মার চোখদুটি জলে ভরে উঠ্‌ল। আর বেশীদূর পড়া হল না। সেজপিসী ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—বৌএর আজ হল কি? বিষ্টি ধরেছে, এইবেলা তুলসীতলায় পিদীম দিয়ে এলে ত হত?...

চিঠিখানি একবার বুকে চেপে, সেটিকে মাথার বালিশের তলায় রেখে, মা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সন্ধ্যাপ্রদীপ জেলে, তুলসীতলায় রেখে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বল্‌লেন—কাঙালের ধন···ওরে আমার মাণিক...

* * *

দুপুরবেলা মা মেয়ের ছেলেবেলাকার কাপড়-জামাগুলি রোদে দিয়ে, ধূলো ঝেড়ে, আবার বাক্‌সের ভিতর তুলে রাখ্‌ছিলেন।

শৈল এসে বল্‌ল—খুড়ীমা, এইমাত্র আমি পারুলের চিঠি পেলাম। তুমি পড়্‌বে?

আগ্রহ করে হাত বাড়িয়ে মা বল্লেন—দে না শৈল, অনেক-দিন ওর কোন খবর পাইনি। তিনি শৈলর হাত থেকে চিঠি-খানি নিয়ে পড়্‌তে আরম্ভ করলেন :—

'ভাই শৈল, তোকে খুব লিখ্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে, কিন্তু কি যে লিখ্‌ব তাই ভেবে পাচ্ছি না! আমার বড্ড ভাল লাগ্‌ছে... জানিস্ ভাই, সে আমার—যাঃ কি ছাইপাঁশ যে লিখ্‌ছি তার ঠিক্ নেই! কিন্তু ভাই, যখন তার কথা শুনি, তখন কি যে মনে হয় তা তোকে বোঝাতে পার্‌ব না। আমার বুক ভরে উঠ্‌ছে শৈল, একেবারে ছাপিয়ে উঠ্‌ছে। মাকে ছেড়ে এখানে এসে প্রথম প্রথম আমার কান্না আর কিছুতেই থামত না। সবাই বিরক্ত হতেন। বল্‌তেন 'এটা ওর বাড়াবাড়ি'।...আজও কাঁদি শৈল, কিন্তু সবার দৃষ্টির আড়ালে, তার মাথার বালিশের ওপর মুখ টিপে। আমার আগের কান্নার সঙ্গে এখনকার কান্নার তফাৎটা শুধু বুঝ্‌তে পারি কিন্তু বোঝাতে পার্‌ব না।

সেদিন আমার জ্বর হয়েছিল। রাতে বড় ছটফট কর্‌ছিলাম। সে এসে আমার মাথার ওপর ছুটি হাত রেখে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল! আমার ভারি লজ্জা কর্‌ছিল, কিন্তু ভাই, ভাল লাগ্‌ছিল তারচেয়ে বেশী। সে আমার মুখের কাছে মুখ এনে ডাক্‌ল—'পারুল'...এত মিষ্টি করে তোরা কেউ আমায় ডাকিস্ নি। আমার মনে হয়, আর কেউ আমায় অমন করে

ডাক্‌তে পারে না। আমি মাথাটাকে টেনে টেনে তার বুকের খুব কাছে এনে রাখ্‌লাম।

মা আমায় নিয়ে যাবার জন্যে এখানে চিঠি লিখ্‌ছেন। মাকে দেখ্‌বার জন্যে আমারও বড় ইচ্ছে করছে; তবুও এখান থেকে নড়্‌তে পার্‌ছি না! মাকে ওজর দেখিয়ে চিঠি লিখ্‌ছি; কিন্তু সে সমস্ত মিথ্যে কথা। মাকে সব খুলে বল্‌তে বড় লজ্জা করে, পারি না। আমি ওকে না-দেখে, ওর কথা না-শুনে থাক্‌তে পার্‌ব না। কাল যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, আমার কপালের ওপর সে—নাঃ তোকে আর ককখন চিঠি লিখ্‌ব না। তোকে লিখ্‌তে বস্‌লে আমার আর কিচ্ছুরই ঠিক থাকে না...'

—মা চিঠিখানির ওপর একবার মুখ রেখে শৈলর হাতে ফিরিয়ে দিলেন। হাসিকান্নায় তাঁর মুখখানি ঝল্‌মল করে উঠ্‌ল।

* * *

সন্ধ্যা হতে আর বেশী দেরি নেই। ঘরে ঘরে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠ্‌ছে। একখানা গাড়ী, বাড়ীর সাম্‌নে এসে থাম্‌ল। কোচ্‌মান দরজা খুলে দিল। ভিতর থেকে নাম্‌ল পারুল! তার সেই তিনবছর পূর্ব্বেকার লাল চেলীখানিতে আর একগাছিও লাল সূতো নেই! সব সাদা হয়ে গেছে...

সেজপিসী আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লেন—ওরে সর্ব্বনাশী রাক্ষসী...

মেয়েকে বুকে চেপে মা নিঃশব্দে চোখের জলে তার মুখখানি ধুয়ে দিলেন!

পারুল বল্‌ল—মাগো, ওরা আমায় আর সেখানে থাক্‌তে দিল

না !...কেন ?...অত বড় বাড়ীতে, কত সুন্দর সাজানো ঘর পড়ে রয়েছে, সে-সব ফেলে, আমার ছোটযাকে, আমার ঐ ঘরখানি কেন দিল ওরা ?... ঐ ঘরে যে আমার সব আছে...ঐ ঘরের ধুলো ঝেড়ে 'তার' ব্যবহার করা জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে যে আমি দিন কাটাতে চাই...আমার যা-কিছু ছিল সমস্তই ওরা নিয়েছে...নিক্ না ওরা আর যা-কিছু আছে...আমায় শুধু ঐ ঘরের মাটিতে মাথা রাখ্‌তে দিক...আর কিছুই চাই না, মাগো... কিচ্ছু না...

পূজারিণী

তুমি কি ওর স্পর্দ্ধা আরো আমার সহ্য করতে বল মন্ত্রী ?

সহ্য করতে আর অনুরোধ করি না মহারাজ ; কিন্তু অমর-সর্দ্দারের কাজের ভিতর কোন স্পর্দ্ধার চিহ্ন ত দেখতে পাই না।

স্পর্দ্ধা নয় ?

না মহারাজ। অঙ্কুর থেকে গাছ বেড়ে ওঠে, সেই বাড়ার ভিতর দিয়ে তার যে একটা স্বাভাবিক গতি আছে, তারই পরিচয় সে দেয়। বেড়ে ওঠা তার স্পর্দ্ধা নয় মহারাজ।

তোমার পণ্ডিত্যে আমি মুগ্ধ হলাম মন্ত্রী, কিন্তু শুনেছ কি, দক্ষিণ সীমান্তের যত পার্ব্বত্যজাতি তাকেই রাজা বলে মেনে নিয়েছে ?—

শুধু তাই নয় মহারাজ, ওরা বলে, 'অমর-সর্দ্দার যে-মাটির ওপর দিয়ে চলে যায়, সে মাটির স্পর্শ পেলে পাপ দূর হয়।' শুধু দক্ষিণ নয় মহারাজ, তার সঙ্গে অন্য তিনটি সীমান্ত-প্রদেশও স্বেচ্ছায় তাদের গর্ব্বিত মাথা ঐ মাটির ওপর লুটিয়ে দিয়েছে। আমরা আছি ঠিক মাঝখানে মহারাজ। আমাদের ঘিরে আছে—অমর-সর্দ্দার আর তার প্রজা, সাগরের জল যেমন করে দ্বীপকে ঘিরে থাকে।

সেই কথাই ত আমিও ভাবছি মন্ত্রী, কিন্তু এবার ঐ

সাগরের তর্জন গর্জন, তার ঢেউয়ের আস্ফালন মাটির সঙ্গে এনে মেশাতে হবে!—

ঠিক কথা মহারাজ, জল আর মাটি যতক্ষণ আলাদা আলাদা থাকে ততক্ষণই ওদের বিরোধ; কিন্তু যেমনি মিশে যায় অমনি দেখি দিকে দিকে রঙিন হাসির বন্যা বহে যাচ্ছে! এবার ঐ জলকে, মাটির সঙ্গে এনে মেশাবার সময় হয়েছে মহারাজ।

তবে আর দেরি নয়,—সেনাপতি!

বাঁকা তলোয়ার কোষ হতে বার করে, রাজার পায়ের নীচে রেখে সেনাপতি বল্‌লেন—মহারাজ!

অমরসর্দারকে এবার নামিয়ে আন্‌তে হবে।

সেনাপতির সঙ্গে সহস্র বীর সেনা গর্জে উঠ্‌ল—'মাটির ওপর'। তাদের অস্ত্রগুলি চঞ্চল হয়ে একসঙ্গে ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠ্‌ল।

মন্ত্রী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লেন—কিন্তু এ কি মহারাজ! এত সেনা, এত অস্ত্রের কি প্রয়োজন?

রাজসভায় অস্ফুট হাসি-বিদ্রূপের আভাস জেগে উঠ্‌ল। একজন বল্‌ল—অমরসর্দার যে গাছের ফল নয়, ইচ্ছা কর্‌লেই তাকে যে নামিয়ে আন্‌তে পারা যায় না, তা হয়ত মন্ত্রী-মহাশয়ের জানা নেই, অমরসর্দারের প্রত্যেক সেনা যে অস্ত্রই দেহের অংশমাত্র ছাড়া আর কিছু নয়, তার পরিচয় সেনাপতি স্বয়ং কিছু পেয়েছেন।

আর একজন বল্‌ল—কিন্তু ভাই, ও কথা মন্ত্রী-মহাশয়কে

বোঝানো একটু শক্ত হবে, কেননা, ওঁর আসনটি রাজসভার মধ্যেই অচল হয়ে থাকে, আমাদের আসনগুলি যুদ্ধক্ষেত্রের নরমেধ যজ্ঞের আগুনের মধ্যে সচল হয়ে বেড়ায়। সেনা আর অস্ত্রের প্রয়োজন তাই আমরাই ভাল বুঝি।

রাজা বিরক্ত হয়ে মন্ত্রীকে বল্‌লেন—এ ছাড়া তাকে নামাবার আর কি উপায় আছে?

মন্ত্রী বল্‌লেন—আছে মহারাজ, আছে। ওকে নামাবার সবচেয়ে সহজ উপায়—ওকে উঠ্‌তে সাহায্য করা।

এ কি পরিহাস?

পরিহাস করিনি মহারাজ, সত্য ভেবেই বল্‌ছি; জয় কর্‌বার ওই ত সহজ উপায়।

কটিবন্ধ হতে তরবারি খুলে নিয়ে সেটি বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে রাজা বল্‌লেন—অর্থাৎ আমার এই মুকুট-পরা মাথাটা ঐ-সমস্ত বর্ব্বরদের সঙ্গে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলি, তুমি এই পরামর্শ দিতে চাও? কিন্তু জান না কি—আমি রাজা? যার মাথায় মুকুট আশ্রয় নেয়, সিংহাসন যার আসন হয়, সাধারণের মধ্যে তার ঠাঁই নেই। সে অনেক উঁচুতে—অনেক তফাতে? মুকুটপরা মাথা মাটির দিকে নুয়ে পড়ে না। জয়করাই তার কাজ, পরাজয় মানা নয়। অমরের সমস্ত তেজ, দর্প, উচ্চাকাঙ্খা আমার এই আসনের নীচে এনে ফেল্‌তে হবে, নইলে রাজার কাজে অবহেলা করা হয়।

কিন্তু মহারাজ, যে আলোকশিখা জ্বলে উঠেছে, তাকে

নিভিয়ে না দিয়ে, তার তেজ, তার ঔজ্জ্বল্যকে বাড়িয়ে তুল্‌লে আপনার অসম্মান ত হবে না। ঐ হবে আপনার যথার্থ কীর্ত্তি। ও কীর্ত্তির শিখা শুধু বেড়ে বেড়ে ওপরের দিকেই উঠ্‌বে, আপনার মহিমা প্রচার কর্‌বে। ওকে নিভিয়ে দিলে ত তা হবে না।

রাজা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হঠাৎ সমস্ত চীৎকার আস্ফালন থেমে গেল, সকলে বিস্মিত হয়ে দেখ্‌ল কে সারঙ্গী বাজিয়ে গান কর্‌তে কর্‌তে সভার মধ্যে আস্‌ছে! কিন্তু সে ত যুদ্ধের গান নয়! ও গানে ত বুকের রক্ত নেচে ওঠে না। ও গানে যে বুক ভেঙে পড়ে, চোখে জল ভরে ওঠে। সমস্ত অভিমান ভুলে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়্‌বার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যেন কোন্ অজানা ব্যথার উৎস জাগিয়ে মনকে পাগল করে দিল!

অবাক হয়ে রাজা বল্‌লেন—কে ও!

রাজার কথার উত্তর কেউ দিল না। সৈন্যদের তরবারি হাতেই রইল, তাকে কোষে রাখ্‌বার কথা যেন সবাই ভুলে গেছে। চোখের পাতা ফেল্‌বার ইচ্ছাও তাদের নেই। স্তব্ধ সভা মুখরিত করে গান উঠ্‌ল,—

ওগো রাজা,—আমার রাজা, মরুভূমির বুকের ওপর যদি শুধু আগুন-বৃষ্টিই কর, তাহলে তার বাঁচা যে বৃথা হয়ে যায়! বুক ভরা যে তার তৃষ্ণার, সে ত আগুন দিয়ে মিট্‌বে না। ওগো রুদ্র, শেষ কর তার দহন, নেমে এস তোমার স্নেহের বর্ষণ নিয়ে।

আগুনে পুড়ে তোমায় ও যে ভক্তি করে, সে ভক্তির জন্ম যে ভয় হতে। মরু তোমায় ও ভক্তি কর্‌তে চায় না, সে চায় ভাল-বাস্‌তে। রাজা, তোমায় ভালবাস্‌তে না পারলে তোমার সঙ্গে তার মিলন ত পূর্ণ হবে না।

রাজা বল্‌লেন,—কে তুমি কুমার? পর্ব্বতের মত দৃঢ় তোমার দেহ, কিন্তু কি লাবণ্যভরা! চোখে তোমার অশ্রুকণা, কিন্তু ওরই আড়ালে কি আগুন লুকানো আছে! কণ্ঠে তোমার ও কি সুর!—কে তুমি কুমার?

রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে গায়ক বল্‌ল—আমি ভিখারী মহারাজ, অন্য কিছু পরিচয় দেবার নেই।

বৎস, তোমার নাম?

ভাই।

বিস্মিত হয়ে রাজা বললেন—সে কি! 'ভাই' ত নাম হতে পারে না?

ঐ নামেই সবাই আমায় ডাকে মহারাজ।

কিন্তু আমি ত তোমাকে ও-নামে ডাকৃতে পার্‌ব না কুমার। তোমার আমার মধ্যে যে একটা মস্তবড় প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে; তাকে সরানো ত যায় না।

সারঙ্গীর তারে মৃদু একটু মীড় টেনে গায়ক বল্‌ল—তবে আমায় দাস বলে ডাকবেন। ও নামও আমায় বেশ মানাবে।

এমন অদ্ভুত কথা ত কেউ কখনো শোনে নি! সেনাপতি বল্‌লেন,—তোমাকে ত কোনদিন এ রাজ্যে দেখি নি!

না সেনাপতি, যদিও এ রাজ্যে আস্‌বার সৌভাগ্য এর পূর্ব্বে আমার হয় নি, তবুও এ রাজ্যের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা বড় গভীর—পাতার সঙ্গে গাছের মত। এ রাজ্যের সীমান্তে আমার বাস।

কোন্ সীমান্তে?

এ রাজ্যের একটি মাত্র সীমাই ত আছে, দ্বিতীয় ত নেই।

কি রকম?

সীমান্তবাসীরা জানে না, উত্তর আছে কি দক্ষিণ আছে, তারা তা জান্‌তেও চায় না। তারা জানে, যে তারা তাদের রাজাকে ঘিরে আছে। তিনিই তাদের লক্ষ্য। রাজা ত বিশেষ কোন একটি দিকেই নেই, তিনি আছেন মাঝখানে। সীমান্ত-বাসীরা তাই সেই মাঝখানটির দিকে তাকিয়ে আছে।

রাজা হেসে বল্‌লেন—বুঝেছি, তুমি বুঝি অমর সর্দারের লোক?

হাঁ মহারাজ।

তাকে তুমি চেন?

চিনি মহারাজ, খুব চিনি। সবাই তাকে চেনে।

তার কিছু পরিচয় তুমি আমায় দিতে পার? আমি জান্‌তে চাই, সে কি করে এই বিশাল জনসমুদ্রের গতিকে আপনার ইচ্ছামত ফিরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। যুদ্ধ ব্যবসা আমার অজানা নয়, শক্তিও আমার অল্প নয়; কিন্তু এ-সমস্ত থাকা সত্ত্বেও ওঁর মত এমন করে সকলকে আমার ইচ্ছার অধীন করে নিতে

পারি নি। তাই সময় সময় মনে হয় অমর-সর্দারের শাসনদণ্ডে মন্ত্রবলও কিছু আছে।

আছে মহারাজ। সে মন্ত্র মুখের কথা—চোখের জলে সিক্ত করা।

ঐ চোখের জল দিয়েই তিনি শত্রু জয় করেন?

হাঁ।

কিন্তু এমন শত্রুও ত থাকৃতে পারে যে চোখের জলকে মানে না।

একদিন তাকে মানতেই হয় মহারাজ।

তুমি তার কি প্রার্থনা নিয়ে এসেছ কুমার?

অমর ধনের কাঙ্গাল নয় মহারাজ। অনশনকে সে ভয় পায় না, ঝড়ঝঞ্ঝাকে তুচ্ছ মনে করে। বাধা-বিপদের বুকেই তার জন্ম। সে পেতে চায় আপনাকে।—কিছুতেই সে আর আপনার কাছ থেকে দূরে থাকৃবে না,—এই তার পণ। আপনাকে এবার নেমে আস্তে হবে।

আমরাও এতক্ষণ সেই আলোচনা কর্ছিলাম। কিন্তু আমি ভাব্ছিলাম তাকেই নামিয়ে আনৃব।

সে ত মাটির ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে মহারাজ। তাকে আর কোথায় নামাবেন? সে চায় আপনিই নামুন, ও সিংহাসনের ব্যবধান তার আর সহ্য হচ্ছে না।

সেই জন্যই কি তার এই বিরাট আয়োজন?

হাঁ মহারাজ।

কিন্তু আমি ত নাম্‌ব না, কেননা আমি রাজা। আর যে-মাটির ওপর দাঁড়িয়ে রাজার ওপর স্পর্দ্ধা প্রকাশ কর্‌ছে, সে মাটিও তার পায়ের তলা হতে সরিয়ে নেব। তাহলেই তার সঙ্গে আমার মিলন সম্পূর্ণ হবে।

কিন্তু মহারাজ, সে ত মাটির ছেলে। তার সে অধিকার কেড়ে নিলেও ত যাবে না। আপনাকেই নাম্‌তে হবে।

আমিও তাই পরখ করে দেখ্‌তে চাই। তোমার সর্দ্দার চোখের জলে অনেক জয়লাভ করেছে; এবার নিজেকে তার সাম্‌নে ধরে দেখ্‌ব সেটা সম্ভব কি না।

সেই ভাল মহারাজ, আপনি পরখ করেই দেখুন, কিন্তু আর অমন করে তার কাছ থেকে দূরে সরে থাক্‌বেন না। অমর আপনার স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে মেখে নেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।

এ স্পর্শ হয়ত সুখের হবে না কুমার।

এ স্পর্শ বড় দুঃখের হবে মহারাজ। কিন্তু অমর ওকে ভয় করে না। সে বলে—'সুখ জিনিসটা সব চেয়ে মিথ্যা। ওটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। দুঃখেই ত আমাদের যথার্থ রূপটাকে দেখা যায়।' অমর ঐ দুঃখকে বরণ করে নিয়ে নিজেকে এবং তার রাজাকে পেতে চায়। আপনাকে সে ঐ সিংহাসন হতে নামাবেই।

সেনাপতি ক্রোধে চীৎকার করে উঠ্‌লেন—এত স্পর্দ্ধা! মহারাজ, চরকে সব সময় ক্ষমা করা উচিত নয়—রাজনীতিতে এ আদেশ আছে।—এর উপযুক্ত—

না সেনাপতি, ওর তুমি কোন অনিষ্টই করতে পারবে না। ওকে নির্ভয়ে ফিরে যেতে দাও। দেখ বৎস, তুমি তোমার সর্দারকে জানিও আমি প্রস্তুত হয়েই আমার আসনে বসে রইলাম।

সারঙ্গীর তারে ঘন ঘন ঝঙ্কার বেজে উঠ্‌ল। সকলে স্তম্ভিত হয়ে দেখ্‌ল, যুবার মুখখানি ক্রমেই আরক্ত হয়ে উঠ্‌ছে। যেন কি গভীর বেদনার আঘাতে দীপ্তিভরা চোখ-দুটী ম্লান হয়ে গেল। কপালের মাঝখানে তিনটি বক্র-রেখা দেখা দিল। ঠোঁটদুটি একবার ধীরে ধীরে কেঁপে উঠে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সুন্দর আঙুলগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে তারের ওপর দিয়ে নাম্‌ছে উঠ্‌ছে, যেন অবসাদে ভরা। নীরবে রাজাকে নমস্কার করে যুবা সভা হতে বেরিয়ে গেল।

সেনাপতি বল্‌লেন—মহারাজ, তরবারিটাকে যত জোরে বুকের ওপর চেপে ধর্‌ছি, মন ততই যেন দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ছে! বার বার করে আপনাকে জিগ্‌গেস কর্‌ছি—ওরে মূর্খ, কার বুকে ছুরি মারতে চাস্?—

রাজা তাঁকে বাধা দিয়ে বল্‌লেন,—চুপ কর সেনাপতি। ও-সমস্ত ভাব্‌বার সময় এ নয়! মনে রেখো তুমি সেনাপতি, আমি রাজা। আজ রাত্রে মন্ত্রণাঘরে তোমার সঙ্গে কিছু পরামর্শ কর্‌বার আছে সেইখানেই আমাদের সমস্ত নিষ্পত্তি হবে।

সেনাপতি নমস্কার করে বল্‌লেন,—যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা সিংহাসন হতে নেমে যোদ্ধাদের উৎসাহিত করবার জন্যে বললেন—আশীর্বাদ করি, জয়ী হও বীরগণ।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল—মহারাজাধিরাজের জয়!

কিন্তু এ সমস্তের ভিতর যেন আর সে তেজ নেই। আগুণের দহন করবার শক্তি যেন চলে গেছে, আছে শুধু আলো—সেও বড় ম্লান।

*   *   *   *

তখন গভীর রাত্রি। রাজা ও সেনাপতি নিঃশব্দে মন্ত্রণা ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দুজনের বুক হতেই দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। রাজা শুষ্ক হাসি হেসে বললেন,—মন্ত্রণাগৃহ আজ মন্ত্রীশূন্য!

পিছন হতে কে ডেকে উঠল—মহারাজ!

বিস্মিত হয়ে রাজা বললেন,—কেও?

অন্ধকার হতে ছায়ামূর্ত্তির মত একজন মানুষ বেরিয়ে এসে রাজাকে প্রণাম করে বলল—প্রেত, মহারাজ, মন্ত্রীর প্রেত। মন্ত্রীর মন্ত্রীত্ব ঘুচেছে, তার সব শেষ হয়েছে। কিন্তু তার আজন্মের পরিচিত এ-সমস্ত ছেড়ে অন্য কথাও সে যেতে চায় না।...আমরা যখন প্রথম এ ঘরে প্রবেশ করি তখন আমরা তরুণ যুবক,—বালক বললেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাজ, তুমি তোমার সমস্ত শক্তি নিয়ে শাসনদণ্ড হাতে তুলে নিলে, আমি আমার সমস্ত বুদ্ধি নিয়ে তোমার সেই প্রচণ্ড শক্তিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এগিয়ে এলাম। সেনাপতি এল তার আগুন-জ্বালা

তেজ নিয়ে। তীব্র প্রতিহিংসার বিষ দিয়ে তোমার সমস্ত শত্রু পুড়িয়ে তোমার চলার পথ পরিষ্কার করে দিল। তারপর কতকাল কেটে গেছে। আজ আমাদের শক্তির শেষ অবস্থায় চোখের সামনে জলে উঠেছে এক তীব্র আলোক-শিখা, ও আমাদের সহ্য হচ্ছে না। আমরা ভাব্‌ছি,—আমাদের এত কালের পরিশ্রম বিফল কর্‌বার জন্যেই ও জ্বলেছে, তাই ঐ আলোক-শিখাটিকে নিভিয়ে দেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছি;—কিন্তু পিছনে যে আমাদের অন্ধকার গভীর হয়ে এল। সূর্য্য যে ডুবে গেছে। ঐ জ্যোতিককে নিভিয়ে দিলে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে গিয়ে ঠিক্‌ পৌঁছাতে পার্‌ব কি না কে জানে? কিন্তু ভাব্‌বারও ত আর সময় নেই—আগুন যে আমাদের বুকের ওপর এসে পড়েছে—এ দহনকে থামাবার শক্তি ও ত আর নেই।—

না নেই, এবার জ্বল্‌তে হবে। তারপর যখন জ্বালা থাম্‌বে, তখনই প্রমাণ পাবে আমরা কোথায় এসেছি।—কিন্তু তুমি আর কেন এগিয়ে আস্‌ছ মন্ত্রী?

মন্ত্রী বল্‌লেন—মন্ত্রনা আমি অনেক দিয়েছি, কিন্তু কাজ কিছুই করিনি। এবার ঐ আগুণের মধ্যে পড়ে দহনের তীব্রতা বুক ভরে অনুভব করে নিতে চাই মহারাজ।

রাজা মন্ত্রীকে আলিঙ্গন করে বল্‌লেন—সেই ভাল। আমি ভেবেছিলাম, সমস্ত জীবন আমরা একভাবে কাটালাম, কিন্তু যখন জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদ এগিয়ে এল, তখন তুমি তোমার জ্ঞানের চোখদুটি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে

দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালে। সেই অভিমানের আঘাতেই আজ তোমাকে সভায় অপমান করেছি—অপরাধ নিও না। আজ রাত্রেই সৈন্তদের মধ্যে প্রচার করে দাও, যে প্রচণ্ড শত্রু তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তার গতি রোধ করবার জন্যে তারা যেন প্রস্তুত থাকে।

* * * * *

দুপুরবেলাকার রোদের তাপে পৃথিবী যেন নিস্তেজ হয়ে আসছিল। কুঞ্জবিতানে ছায়াশীতল মর্ম্মরবেদির ওপর কচি-পাতার শয্যা বিছিয়ে রাজকন্যা বিদ্যুল্লেখা শুয়েছিলেন। চোখের পাতা রুদ্ধ। কপালের ওপরকার অল্প একটু বাঁকা রেখা হতে বুঝতে পারা যায় যেন তিনি কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। একখানি হাত মাথার নিচে, আর একখানি অলসভাবে বুকের ওপর পড়েছিল। সখী মঞ্জুলিকা, কাছে বসে পদ্মপাতা দিয়ে তাঁকে বাতাস করছিল। গাছের শাখায় একটি কপোত তার সঙ্গীটিকে ডেকে ডেকে সারা হচ্ছে। বনের ভিতর তার কান্নার প্রতিধ্বনি বেজে উঠছে। রাজকন্যা বললেন—তোর কথাই সত্য মঞ্জুলিকা, সবার কথাই সত্য। আমিই ছিলাম ভ্রান্তির মধ্যে।

মঞ্জুলিকা বলল—কিসের ভ্রান্তি রাজকুমারী?

রাজকন্যা বললেন—দেখিস নি, মানুষ জ্যৈষ্ঠমাসের রোদের তাপে দেহের চারপাশে আগুন জেলে বসে থাকে?—ওর নাম তপস্যা। মাথার ওপর জটার ভার যত বেড়ে চলে, ততই ওরা ভাবে ওদের সিদ্ধিলাভের পথটা সহজ হয়ে আসছে। দেহের

কষ্টটাই যেন তাই তাদের একটা অবলম্বন হয়ে ওঠে। ঐ হয় তাদের গর্ব্ব—এতবড় পাথর আর কারো বুকে বসেনি এত বড় জটা আর কারো মাথায় ঠাঁই পায়নি। মন থাকে তাদের ঐ জটা আর পাথরের সঙ্গে বাঁধা। তাই মূর্ত্তিমতী সিদ্ধি সহস্র হাত বাড়িয়ে ওদের যখন বুকে নেবার জন্য এগিয়ে আসেন, ওরা তাঁকে দেখ্‌তে পায় না। ভোরের আকাশের স্নিগ্ধহাসি সন্ধ্যাতারার অশ্রুকণা ওদের কাছে অর্থহীন।—আমিও ছিলাম ঠিক্ এই ভ্রান্তির মধ্যে মঞ্জুলিকা। নিজের রূপের সুরা নিজে পান করে বিভোর ছিলাম, তাই বনের পশু হতে মানুষ পর্য্যন্ত সবাইকে যখন দেখ্‌তাম, এই রূপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মর্‌বার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে, তখন ওর ভিতর আশ্চর্য্যের কিছুই দেখ্‌তে পেতাম না। ওদের ঐ আত্মসমর্পণ যেন বড় স্বাভাবিক, ও যেন আমার প্রাপ্য।—আমাকে ওরা দিয়েছে, কিন্তু আমি নিই নি! অনাদরে সব পথের ধূলায় ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে গেছে।...

পুষ্পপুরের রাজা, পিতাকে দূতের মুখে যেদিন খবর পাঠালেন—রাজ্য জয় করাতে তাঁর ক্লান্তি এসেছে, ওতে তিনি নিজের যথার্থ শক্তির পরিচয় পান না, তাই এবার এমন কিছু জয় কর্‌তে চান যা জগতের চোখে সব চেয়ে দুরূহ। সকলে বুঝ্‌ল তাঁর কি অভিপ্রায়।

তারপর তিনি এলেন, অতুল, ধন-ঐশ্বর্য্য নিয়ে। পিতা তাঁকে সমাদরে রাজসভায় এনে বসালেন। আমি আড়াল হতে দেখ্‌লাম —যেন জলন্ত উল্কা! তাই তাঁর সঙ্গে আমার বিরোধটাও বাধ্‌ল

বেশী করে। তারপর সে উল্কা নিজের আগুনে নিজে জ্বলে জ্বলে কোন্ অন্ধকারের আবরণে গিয়ে মুখ লুকাল তা কে জানে!...

এমনি করে সিদ্ধি বহু বার আমার দ্বার হতে ফিরে গেলেন, তাঁকে চিন্‌লাম না। কিন্তু এবার নিজেকে চিনেছি মঞ্জুলিকা। রাজকন্যার রূপ-রত্নে ভরা দেহের আড়ালে যে ভিখারিণীটা তার অনন্ত দৈন্য নিয়ে নীরবে পড়েছিল, তার বুক এতদিনে ফেটে গেছে। চোখের জল আর তাই বারণ মানে না। কাল সন্ধ্যা-বেলা পথিক যখন আমার বাতায়নের নীচে দিয়ে গান করে গেল—দেবার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে রয়েছে—কিন্তু নেবার যে কেউ নেই...আমি মরে গিয়ে আবার এক নিমেষে যেন নূতন করে জন্মালাম!

মঞ্জুলিকা বল্‌ল,—শুধু তুমি একা নও রাজকুমারী, এ রাজ্যের সমস্ত নরনারী ঐ একটি কথাই বল্‌ছে। এক রাত্রে এত বড় বিপর্য্যয় কি করে সম্ভব হল জানি না!—ভোরের বেলা, রাজার যুদ্ধ ঘোষণা শুনে পুরবাসীরা যখন পথে বেরিয়ে এল, শত্রু তখন তাদের বুকের ওপর! লড়াইটাও হল আশ্চর্য্য রকমের। হার মেনেছে সবাই—মরেছে সবাই। কাল সন্ধ্যাবেলাকার একজন মানুষকেও আর দেখ্‌তে পাবে না। সমস্তরই বদল হয়ে গেছে।

রাজকন্যা বল্‌লেন,—কিছুই আর অসম্ভব বলে মনে হয় না মঞ্জুলিকা। তাই বুঝি আজ সকালে গানে গানে পৃথিবী ভরে উঠেছিল? সে কি শত্রুর জয় গান? তবে আমরা বন্দী?...

হাঁ রাজকুমারী, এ রাজ্যের সবাই বন্দী, শুধু রাজা ছাড়া।

তিনি আছেন বড় দ্বিধার মধ্যে, বহু যুগ সঞ্চিত অভিমান বুকে চেপে।...

শত্রুরা তাহলে কি করবে? তিনি যদি হার না মানেন?...

ওরা হার মানাবে। মাথার ওপর হতে মুকুট সরিয়ে নিয়ে মাটির ওপর এনে দাঁড় করাবে।...

এ রাজ্যের একজনও ওতে বাধা দেবে না?

না। তার কারণ, সত্যের পরিচয়টা তারা আগেই পেয়েছে, রাজার মত তারা দুর্ভাগা নয়। তাই সবাই চীৎকার করে উঠছে—'রাজা তুমি নেমে এস! হাওয়ার আসন ছেড়ে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে বল—বহু নর-রক্ত-পান-স্ফীত রাক্ষস আর নেই,—মরেছে—মানুষের স্পর্শে সে ও মানুষ হয়েছে।—অন্ধ দেখতে পায় না, কিন্তু তার দৃষ্টি হীনতার বাইরে প্রকৃতির যে লীলানাট্য চলছে সে ত মিথ্যা নয়। শুধু তাকে অস্বীকার করলেই ত আর তার স্থিতিকে মেরে ফেলা যায় না, সে বেঁচেই থাকে। ঐ অস্বীকার করার ভিতর দিয়ে সে শুধু তার অন্ধত্বের পরিচয়ই দেয়।—রাজা গোপনে এক বিদেশী রাজার সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন।

শত্রুরা তা জানে?

খুব জানে, তাই যেন ওরা আরও খুসী হয়ে উঠেছে।

রাজকুমারী বললেন—মঞ্জুলিকা, এবার তুই যা। আমি একটু একা থাকতে চাই। মনের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো মাথা তুলছে, তার একটা মীমাংসা করতে চাই।

মঞ্জুলিকা চলে গেল, কিন্তু যাবার সময় রাজকুমারীর মনের ওপরকার একখানি কুয়াসার আবরণ যেন সরিয়ে নিয়ে গেল। তিনি ভাবলেন—সবাই হার মেনেছে! মানুষেই ত; অত বড় সত্য চোখের সামনে যদি এসে দাঁড়ায়, তাকে ভাল লাগুক আর নাই লাগুক অস্বীকার করবার শক্তি ত থাকে না। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! একি প্রচণ্ড শক্তির আবির্ভাব! বন্যার মত এক নিমেষে এতকালের সঞ্চিত কলুষ মুছে নিল! হায় রাজা, হায় গো, রাজকুমারী, তবু তোমরা শত বজ্রাঘাতে জীর্ণ অহঙ্কারের তরীটিকে আশ্রয় করে ঐ মহাশক্তির স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাও? ভেঙ্গে ফেল তোমার তরী।—ওরই মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে বাঁচ।...

ঘন পাতার আড়াল ঠেলে অস্তমিত সূর্য্যের ম্লান রশ্মিরেখা বনের ভিতর এসে পড়েছে। শ্রান্ত বাতাস ধরণীর বুকের দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বিষাদে গড়িয়ে গড়িয়ে বহে যাচ্ছে। বকুল ফুলের রাশি শাখাচ্যুত হয়ে রাজকন্যার নিশ্চল মূর্ত্তিটিকে ঘিরে তাঁর পূজা করবার জন্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। বনের বুকের ভিতর হতে কান্না জেগে উঠল—ওগো পথিক, সঙ্গীহারা পথিক! দিনের আলো নিভে এল, সামনের পথ যে অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে! সবাই পথ ছেড়ে চলে গেল—তোরই শুধু চলার বিরাম নেই! বোঝার ভারে মাথা যে তোর নুয়ে পড়ছে। মন তোর কেঁদে বলছে—পারি না, আর এ ভার বইতে পারি না—ও সইবে না। কোথায় ওকে নামাবি? কোথায় পাবি ঠাঁই? কোথায় আছে ঠাঁই?...

রাজকন্যা অবাক হয়ে বললেন—এ কি শুনলাম? ও যে আমারই কান্নার প্রতিধ্বনি!...

তিনি সেই সুর লক্ষ্য করে বনের ভিতর এগিয়ে চললেন। চারিপাশের লতা গুল্ম তাঁর সর্ব্বাঙ্গের স্পর্শ নিচ্ছে। দু একটি শাখা তাঁর চুলের ভিতর তাদের সরু সরু আঙুলগুলি দিয়ে তাঁকে যেন ধরে রাখ্তে চায়। কুন্দফুলের গাছ ফুলভরা শাখা বাড়িয়ে তাঁর ঠোঁটের স্পর্শ নিল। অপরাজিতা তাঁর পায়ের আঙুলগুলি ছুঁয়ে আনন্দের আবেগে যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্ল। অনেক দূর এসে যেন নিজেকেই খুঁজে বার কর্বার জন্যে সন্ধ্যামালতীর মঞ্জরীগুলি ধীরে ধীরে সরিয়ে দেখ্লেন—সেই গানের সুর রূপ ধরে ফুটে রয়েছে!—কিন্তু সে ত রাজকন্যার প্রতিমূর্ত্তি নয়। মুকুরে ও-ছবি প্রতিফলিত হতে কোন দিন ত দেখেন নি! তবু যেন সে অপরিচিতও নয়। ভোরবেলাকার আধ-ঘুম আধ-জাগরণের মধ্যে স্বপ্নে দেখা মুখের মত! রাজকন্যা হাতদুটি কম্পিত বুকের ওপর চেপে নিঃশব্দে তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন।

গান থাম্‌ল না—কিন্তু সুরের বদল হয়ে গেল। এ সুরে আর শুধু কান্না, শুধু নিরাশা নেই—আনন্দে অভিমানে ভরা। দুটি চোখের বুভুক্ষিত চাহনি, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ হতে যেন তাদের অনন্ত ক্ষুধার শান্তি করে নিচ্ছে! রাজকন্যার ইচ্ছা হল ঐ ক্ষুধার হুতাশনে নিজেকে উজাড় করে আহুতি দিয়ে ফেল্‌তে।...

গোধূলির আলো রাজকন্তার মুখের ওপর পড়্‌ল। চোখের পাতা জলে ভরে আস্‌ছে। বুকের কাঁপন বেড়ে চল্‌ল। ঠোঁটের ওপর রক্তরাগ ম্লান হয়ে গেল। তিনি অপরিচিতের মুখের ওপর মুগ্ধ ছুটি চোখ তুলে যেন আপনার মনেই বল্‌লেন,—তোমায় আমি কখনও দেখি নি, কিন্তু আমার সমস্ত দিয়ে তোমায় অনুভব করেছি, তোমার পরিচয় পেয়েছি, তাই এবার এসেছি হার মান্‌তে। নাও জয় কর। জয় করে আমায় বাঁচাও।

রাজকন্তার সুন্দর কপালের নীচে ভ্রু ছুটি যেখানে পরস্পরের মিলনের সৌন্দর্য্য জগতকে দেখাচ্ছে, সেইদিকে তাকিয়ে যুবা বল্‌ল—জয় করাই ছিল আমার ব্রত, অনেক করেছি, আর নয়। কিন্তু এবার ভিক্ষাও আর নেব না।

রাজকন্তা বল্‌লেন—তবে পাওয়া কি করে সম্ভব হবে?

বিনিময় করে।

কিসের বিনিময়?

ব্যথার।

তারার প্রদীপ জ্বলিয়ে দিয়ে নিশীথিনী তিমির-বসনাঞ্চলখানি মুখের ওপর টেনে দিল। ফুলের কুঁড়ি তাদের পাপড়ীগুলি খুলে দিয়েছে, বাতাস সুধার গন্ধ আকাশের গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যুবা সরে এসে, আপনার গলা হতে একখানি হার খুলে নিয়ে রাজকন্তার গলায় পরিয়ে দিয়ে তাঁকে বুকে চেপে মুখে চুমা দিয়ে বল্‌ল—ওগো প্রিয়া, এতদিনে ঠাঁই পেলাম, বোঝা আমার নাম্‌ল। আমায় বাঁচালে।

যুবার দেহ আশ্রয় করে রাজকন্যা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজপ্রাসাদের নহবৎখানায় বাঁশী বেজে উঠ্‌ল।

যেন ভয়ানক একটা আঘাত পেয়ে কেঁপে উঠে রাজকন্যা যুবার বুক হতে মাথা উঠিয়ে নিয়ে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে যুবা তাঁর মুখের দিকে তাকাল। রাজকন্যা কেঁদে বল্‌লেন—ভুল হয়ে গেছে বন্ধু, সমস্ত ভুল। আমি নিজেকে তোমার হাতে বিকিয়ে দিতে এসেছি, কিন্তু আমি ত আমার নই। নিজেকে কি করে তোমায় দেব? আমি নিজেই যে বিকিয়ে আছি আমার জন্মের বহু পূর্ব্ব হতে! রাজপ্রাসাদের ঐ বাঁশি সেই কথা আমায় স্মরণ করিয়ে দিল।—বিনিময় ত হল না! দরকার নেই বিনিময়ে। তুমি লুটে নাও। দস্যুর মত সব লুটে নিয়ে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাও। ধনীর ভাণ্ডারে সহস্র আবরণের অন্তরালে পড়ে মণিমুক্তা যেমন কেঁদে উঠে বলে—আমায় আলোয় এনে রাখ, খোলা বাতাসের স্পর্শ মেখে নিতে দাও। তেমনি করে আমার প্রাণ কেঁদে বল্‌ছে—নিয়ে যাও, সমস্ত জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন নির্ব্বাসিত এই আভিজাত্যের গণ্ডি হতে মুক্তি দাও।...

ম্লান হেসে যুবা বল্‌ল—কিন্তু ওতে যে আমি দস্যু হয়েই রইলাম। আমার অনন্ত দৈন্যকে ওরা দস্যুর লোভ বলেই জান্‌ল। তোমাকে যারা সহস্র শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রেখে ভাব্‌ছে তোমার আসনটি ঠিক জায়গায় পাতা হয়েছে, তাদের সঙ্গে আমার বিরোধ তাহলে ত মিটবে না। থাক তুমি তোমার

বাঁধনের মধ্যে। আমি থাকি এই অনন্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে,—এখান হতে ওদের জানাব ও বাঁধন মিথ্যা, আমার মধ্যেই তোমার মুক্তি, তোমার ঠাঁই।

বনের ভিতর কাদের অট্টহাসি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। লক্ষ মশাল যেন রক্তচক্ষুর মত এক নিমেষে জ্বলে উঠে ছুটে এগিয়ে আস্‌ছে, ঐ দুটি প্রাণকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেল্‌বার জন্যে।

যুবার গলা জড়িয়ে রাজকন্যা উৎকণ্ঠিত হয়ে বল্‌লেন—কি হবে? এবার কোথায় তোমায় লুকাব?

যুবা বল্‌ল—এইবারই হবে পরীক্ষা সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। কিন্তু আমায় লুকিয়ে রাখ্‌লে ত তা হবে না। মিথ্যাকে বাধা দিলে তার পরমায়ু বৃদ্ধি করা হয়। জলুক ও আপনার আগুনে পুড়ে ছাই হোক আপনার পাপে।...

যুবাকে বাধা দিয়ে ব্যাকুল হয়ে রাজকন্যা বল্‌লেন—এল, ওগো এল! ঐ শোন ওদের মত্ত কোলাহল!...

যুবা বল্‌ল—আসুক না ওরা, আর ত ভয় নেই, আমি যে ঠাঁই পেয়েছি।...

রাজকন্যা চোখের কোণ হতে অশ্রুকণা মুছে ফেলে বল্‌লেন— তোমায় কি নামে মনে রাখ্‌ব?—কি বলে তোমায় পূজা করব?...

যুবা বল্‌ল—তুমি যে নামে আমায় ডাক্‌বে, সেই হবে আমার যথার্থ নাম।...

সহস্র কণ্ঠের বজ্র নাদের অন্তরালে—একটুখানি কান্না অনন্ত শূন্যে মিলিয়ে গেল। রাজকন্যা বল্‌লেন—স্বামী...

যুবা বল্‌ল—প্রিয়া...

* * * * *

সেনাপতি বল্‌লেন—মহারাজ, এর কি বিধান কর্‌বেন?

রাজা বল্‌লেন—প্রাণদণ্ড। কাল সকালবেলা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্দীর মাথা মাটির উপর লুটিয়ে পড়া চাই।

মূর্চ্ছিত রাজকন্যাকে নিয়ে রাজা এলেন অন্তঃপুরে। শিকল বাঁধা দেহটিকে টেনে টেনে বন্দী এগিয়ে চল্‌ল কারাগারের দিকে। পৃথিবীর মানুষ ঘুমিয়ে পড়্‌ল—জেগে রইল শুধু ঐ মরণ পথের যাত্রী, কারাগারের ছোট একটু জানালার ফাঁক দিয়ে যে তারার আলো দেখা যাচ্ছিল সেই দিকে তাকিয়ে। তারপর তারার আলো নিভে গেল। আকাশের গায়ে ব্যথাতুরের চোখের মত একটুখানি রাঙা আভাস দেখা গেল।

বন্দী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—এস এস ওগো মরণ, তোমায় নমস্কার। হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়,—তোমায় নমস্কার, হে অগতির গতি, তোমায় নমস্কার...তোমায় নমস্কার...

কারাগারের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। ঘাতক এসে বন্দীকে বল্‌ল—সময় হয়েছে...

পায়ের শিকলগুলি আর একবার বেজে উঠ্‌ল। বন্দী ঘর হতে বেরিয়ে পথে এসে দাঁড়াল। তারপর সৈন্যদের তরবারি আর বর্শার বেড়ার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌ল।

চোখে তার জল নেই, মুখে তার হাসি নেই। কোন বেদনার আভাষও ফুটে নেই! পায়ের শিকল অবিশ্রান্ত বেজে উঠছে ঝম্-ঝম্-ঝম্। মুখ দিয়ে তার কথা বেরিয়ে আসছে অবিশ্রান্ত—ওগো মাটি আমার জননী, তোমাকে চোখ ভরে দেখেছি, বুক ভরে ভালবেসেছি, প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছি। তোমার ধূলা ছিল আমার দেহের ভূষণ—আনন্দ করে, গর্ব্ব করে মেখেছি, তৃপ্তি পেয়েছি। আর কিছু কামনা নেই। কাজ আমার সারা হয়েছে—বিদায়, মাগো বিদায়...

পাখীদের প্রভাতী গান শোনা গেল না, কিন্তু হাজার মানুষের কান্নার সুর আকাশ ভরিয়ে তুলল,—এ কি খেলা তোমার সর্দ্দার? ভয়ে যে আমাদের বুক শুকিয়ে আসছে! বহু বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিলে এতদিন, কিন্তু তাতে সুখ ছাড়া দুঃখ পাই নি। আর আজ আমাদের এমন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছ, যেখান থেকে তোমাকেও ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না, সামনের পথটাকেও অন্ধকারে ঢাকা দেখছি! কি আছে ঐ অন্ধকারের আড়ালে? কিন্তু আর জানতেও চাই না। আমাদের খেলা যেমন চলছিল তেমনিই চলুক। আমাদের আর বাধা দিও না। তোমাকে আমরা রাজার কাছথেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাব। তোমার বারণও আর মানব না।—

নির্ব্বাণ-উন্মুখ প্রদীপের শিখা যেমন একবার পূর্ণতেজে জ্বলে ওঠে, তেমনি করে সর্দ্দার, তার আরক্ত চোখদুটি সকলের মুখের

ওপর তুলে বল্‌লেন,—সমস্ত জীবন ধরে যে মহাসত্যকে পাবার জন্যে অনন্ত দুঃখ সহ্য করে এলে, সেই সত্য যখন স্পষ্ট হয়ে তোমাদের জীবনে দেখা দিল, তখন কি তোমরা সরে গিয়ে মিথ্যাকে আসন ছেড়ে দিতে চাও ?

কিন্তু সর্দার, রাজা যে তোমায় বধ করতে চান ?

সর্দার হেসে বল্‌লেন—না গো না, পারবে না। তোমাদের শত সহস্র রাজা এলেও আর তা পারবে না। এ হবে ওদের স্বার্থের বলিদান, আমি বেঁচেই থাক্‌ব।...

সর্দার বুকের ওপর হাত জুড়ে রাজপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন,—হে আমার প্রাণ, তুমি রইলে এই মাটির বুকে। যাবার বেলায় তোমায় দেখ্‌লাম, তোমায় চিন্‌লাম, তোমার স্পর্শ পেলাম। এ আমার মহাসৌভাগ্য। এই সৌভাগ্যের গর্ব্ব বুকে নিয়ে মরণের রাতগুলি জেগে কাটাব।—বিদায় প্রিয়া...

* * * *

সুপ্ত কন্যার মাথা কোলে নিয়ে রাজা বসেছিলেন। যে সমস্ত সংশয় মনে জাগ্‌ছিল সেগুলিকে নির্ম্মূল করে বিনাশ করতে করতে ক্লান্তিতে বুক ভরে উঠ্‌ছিল। ঘরের প্রদীপ কখন নিভে গেছে। বাইরে দুএকটি পাখী ডেকে উঠ্‌ছে। উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়ে প্রভাতআলো ঘরের ভিতরে এসে পড়্‌লো। রাজা হঠাৎ চীৎকার করে উঠ্‌লেন্—মাগো, মাগো ও কি !...।

সেই শব্দে জেগে উঠে রাজকন্যা বিহ্বলের মত রাজার মুখের

দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে তাঁর সমস্ত কথা মনে পড়ে গেল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—সকাল হয়েগেছে, না মহারাজ?

রাজা বল্‌লেন—হাঁ মা। কিন্তু ও কি তোর গলায়? কোথা হতে পেলি ও তুই? দেখি—দেখি!

রাজকন্যা হারটিকে বুকের কাপড়ের নীচে লুকিয়ে রেখে বল্‌লেন—না মহারাজ, ও দেবো না।

রাজা বল্‌লেন—ও যে আমার!...তোর মা একদিন ঐ মালা পরিয়েছিল আমায়। তারপর ওকে হারাই। তুই তখন খুব ছোট, নিজের শক্তির পরিচয় দেবার জন্যে গভীর বনে সিংহ শিকার করতে এসে বুঝ্‌তে পার্‌লাম সিংহ-ই আমায় শিকার করেছে! সে ছিল আমার বুকের ওপর। আমার তখন জ্ঞান ছিল না। জেগে উঠে দেখি সিংহ আমার পাশে পড়ে আছে! আর তার বুকে তীর বেঁধা! আশ্চর্য্য হয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখ্‌তে পেলাম দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ব্যাধবালক! তার কাছে এসে আমার গলার মালাটি পরিয়ে দিলাম।—তুই ও কোথা হতে পেলি?...

রাজকন্যা শান্তভাবে বল্‌লেন,—আমার স্বামী আমায় এ মালা দিয়েছেন মহারাজ, ও তোমার নয়।—

মেঘের পর্দ্দা সরিয়ে তরুণ সূর্য্যের আলো বেরিয়ে এল। রাজা বলে উঠ্‌লেন—ওরে রাখ্—রাখ্—

তিনি পাগলের মত ছুটে পথে বেরিয়ে এলেন।

বন্দী তখন সেই অম্লান রবির ওপর চোখ তুলে বল্‌ল—তোমায় এত দেখ্‌লাম তবু তৃপ্তি হল না! তোমায় নমস্কার...

ঘাতকের তরবারি শূন্যে উঠেই বিদ্যুৎ গতিতে আবার নেমে এল।

রাজা এসে দেখ্‌লেন ঘাতকের পায়ের কাছে বন্দীর মাথাটি পড়ে আছে, কিন্তু তাঁর মুখের ওপর হতে অভিমানের আভাসটি তখনও মিলিয়ে যায় নি!

সকলে জিগ্‌গেস করল—মহারাজ, মাটির ওপর আজ যে রক্তবৃষ্টি কর্‌লেন—কি দিয়ে তা মুছ্‌বেন?...

রাজা সেনাপতির মুখের দিকে তাকালেন। সেনাপতি মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—তাই ত! কি দিয়ে ও মুছ্‌ব?...

রাজকন্যা এসে বল্‌লেন—ওগো, পাহাড়ের বুক হতে জেগে, ঐ মহানদ সাগরের উদ্দেশে যাবার পথে যাদের স্নেহস্পর্শ দিয়ে গেছে, আমি তাদেরই মধ্যে একজন। আমি তার শেষ স্পর্শ পেয়েছি। তোমাদের সঙ্গে এক ফাঁসে সে আমাকেও বেঁধে রেখে গেছে...

রাজা বল্‌লেন—মাগো, তুমি এখানে কেন?—ফিরে চল।

কোথায় ফির্‌ব?—

প্রাসাদে।

রাজকন্যা বল্‌লেন—ও আমার নয় মহারাজ, আমার ঠাঁই আমি পেয়েছি। ভুল আমার ভেঙেছে। সমস্ত বাঁধন ভেঙে

বাইরে এনে সে আমায় মুক্তি দিয়ে গেছে। এত বড় জগৎ ফেলে প্রাসাদে আর মন বস্‌বে না, মহারাজ।

আমি যে তোর পিতা, তুই যে আমার মেয়ে...

মৃত বন্দীর দিকে হাত বাড়িয়ে রাজকন্যা বল্লেন—ওর চেয়েও এক বড় সত্যের পরিচয় পেয়েছি মহারাজ। ওকে যেখানে নির্ব্বাসিত করেছ, সেই আমার ঠাঁই, ওকে যারা ভাল-বেসেছিল তারাই আমার আপনার...

পৌরজন কেঁদে বল্‌ল—মাগো, এখনও অমরের কথা হাওয়ায় মিলিয়ে যায় নি; সে বলছিল—আমার প্রাণ রইল এই মাটির ওপর, তাকে তোমরা পাবে।—ধন্য হল জীবন মাগো, পুণ্য হল...

* * * *

রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি আপন আপন আসনে পূর্ব্বের মতই এখনও বসে থাকেন। কিন্তু সভাসদ আর কেউ নেই। কবিরা গান করে না। পণ্ডিতদের তর্ক চলে না। মল্লদের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধও আর হয় না। শুধু তিন জনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। একদিন সেনাপতি বল্লেন—মহারাজ, আর যে এমন করে, থাক্‌তে পারি না। ইচ্ছা করে ছুটে পথে বেরিয়ে গিয়ে সকলকে বুকে চেপে ধরে বলি—'ভাই'। মানুষের সেবা করে হাত দুটিকে সার্থক করি।

রাজা বল্লেন—সে হবে না সেনাপতি। অত সহজে নিষ্কৃতি নেব না। এখন যদি এই রাজাসন ছেড়ে যাই, তাহলে যে মুক্তি পেলাম। শাস্তি পেলাম কই? অনেক অপরাধীর

শাস্তি-বিধান করেছি, এবার নিজের বিচারের সময় এসেছে।—নড়্‌ব না। মাথার ওপর মুকুটের ভার বাড়্‌তেই থাকুক। রাজদণ্ডের চাপে দেহ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাক্‌। মাটির ওপর দেহ ঢেলে শুয়ে পড়্‌বার জন্যে প্রাণ তিল তিল করে মর্‌তে থাকুক। তবু সিংহাসন হতে নাম্‌ব না। অমর এল আমায় মুক্তি দিতে, আমি গেলাম তাকে বাঁধ্‌তে। কিন্তু যে যে চিরমুক্ত, নিজের মনের অহঙ্কারের অন্ধকারে পড়ে তা বিশ্বাস করতে পারি নি। আকাশ তাকে মাটির মলিনতা হতে আপনার অমলিন বুকে লুকিয়ে রেখেছে, আমি বাঁধা পড়েছি তাই আমারই বাঁধনে।...

রাজসভায় আর সহস্র দীপ জ্বল্‌ল না। আলো বাতাসও বুঝি আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিল!...এই শূন্যতার ভার বুকে নিয়ে তিনজনে রাজত্ব করতে লাগ্‌লেন। মাঝে মাঝে বাইরের হাসি-কান্নার প্রতিধ্বনি তাঁদের নাড়া দিয়ে যেত,—বিধাতার বজ্রের মত।...

যেখানে অমরের দেহ মাটির ওপর পড়ে ছিল, সেখানে জেগে উঠল এক মন্দির, রাজকন্যা বিদ্যুল্লেখা এ মন্দিরের পূজারিণী। দিবারাত্র পূজার গান বাতাসে ভেসে বেড়ায়। সে গান যেন অমরের ব্যথার কান্নারই প্রতিধ্বনি।

অনন্ত আশা

পাখী ডেকে উঠ্‌ল—এল এল—সে এল !...

আশার আবেগে স্পন্দিত বুক চেপে সবাই বলে উঠ্‌ল—কে এল.. কোথায় ? ..ওগো কেমন তার রূপ ?...

পাখী বলে—দেখিনি। তাকে দেখিনি আমি চোখে। সে যখন আসে, আমার বুকের ভিতর তার পায়ের ধ্বনি শুন্‌তে পাই—ঐ টুকুই আমি চিনি...উঠ্‌ছে—পড়্‌ছে ঐ যে তার পাখাখানি ...সে এল !...বুঝি সে এল...বাতাস হয়ত জানে তার কথা—

বাতাস বলে—আমি ? না—না, কিছু জানি না—কিছু না... আমি শুধু তার স্পর্শ পাই যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে...তাই কেঁপে উঠি ...মোহন সে। ঐ টুকুই শুধু জানি। ফুল জানে তার সব কথা—

ফুল বলে—ওগো না-না। সব কি করে জান্‌ব আমি ?—তার কি শেষ আছে ? আমি শুধু দেখেছি তার হাসিটি...সুন্দর সে। আর কিছুই জানি না। আমি যে বাঁধা আছি একটু খানি জায়গার মধ্যে...অনেক নীচুতে...এখান থেকে তাকে কি করে জান্‌ব ? নদী জানে তার কথা—

নদী বলে—না গো না ; জানি না—জানি না। তাইত আমার ঘরের আগল ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছি। অসীম সে। এই কথাই ত সবাই বলে। তাই ছুটে চলেছি সাগরের কাছে। সে জানে তার কথা—

সাগর বলে—ভুল ভুল। সে আছে আমার অসীমতারও বাইরে...আমি শুধু হারিয়ে গেছি আমারই মধ্যে। নির্মল সে। আকাশ জানে তার কথা—

আকাশ বলে—আমি তোমাদের সকলের চেয়ে নিরুপায়। আমি তার কিছুই জানি না। আমার কোটি কোটি জলন্ত চোখ দিয়ে খুঁজেও তাকে পাই না!...যতদূর দৃষ্টি যায়, আমি শুধু আমার শূন্যতাকেই দেখি...শুধু আপনাকে...আমার বাইরে আর কিছুই দেখতে পাই না! অজ্ঞেয় সে। নিশীথিনী জানে তার কথা—

নিশীথিনী বলে—হায় হায়!...আমার নয়নের মণি সে যে... তাকে হারিয়ে যে আমার কিছুই নেই...তাইত পাখীর গান শোনবার জন্যে স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকি! ও গেয়ে উঠলেই মনে হয়,—বুঝি সময় হয়েছে তার আসবার...

বাতাস বলল—আমি তারই স্পর্শের মাধুর্য্য ছড়িয়ে বেড়াব জগৎময়।

ফুল বলল—আমি রেখেছি তার জন্যে আমার সুরভি।

পাখী বলল—সে যখন আসবে, তখন এমন গান গাইব—কিন্তু ভাই, যদি না সে গানে হাসি থাকে...যদি চোখে জল ভরে ওঠে...সুর ভুলে যাই...

বাতাস বলল—আমিও তাই ভাবি। যদি তার স্পর্শ আমায় পাগল করে দেয়...যদি পাগল হয়ে ছুটে বেড়াই আকাশ কাটিয়ে, জগৎ কাঁপিয়ে, চীৎকার করে...

ফুল বলল—আর যদি তার আসবার পূর্ব্বেই আমার হাসি

সব ফুরিয়ে যায়...যদি সুরভি শুখিয়ে যায়...আমার ঝরে পড়া শুখ্‌নো দল গুলিতে কি তার তৃপ্তি হবে? ভাই পাখী, তুমি ত চেন তার পায়ের শব্দ, দেখ না, সে এখনও কত দূরে...

পাখী বল্‌ল—কি জানি! কিন্তু শুন্‌ছি,—প্রতি মুহূর্ত্তে শুন্‌ছি একটি একটি করে তার পায়ের শব্দ...সে আস্‌ছে—এল বুঝি!...এই শুধু মনে হয়...ভাই বাতাস, তুমি ত তার স্পর্শ চেন; একবার দেখে এস না—কোথায় সে...

বাতাস বল্‌ল—পাই না—পাই না। কোথাও পাই না তাকে...মনে হয় পেয়েছি...ধরেছি তাকে বুকে চেপে—কিন্তু না!...কোথাও নেই...

নদী বল্‌ল—তবে কি সে নেই?...তবে বৃথাই আমার চলা?...

সাগর বল্‌ল—সে নেই?...তবে বৃথাই আমার কান্না!

আকাশ বল্‌ল—বৃথাই আমার খোঁজা?...

নিশীথিনী বল্‌ল—অন্ধ হয়েই থাক্‌ব অনন্তকাল?...সে নেই...আছে।

কে তুমি বল্‌ছ—সে আছে? তুমি কি জান তার খবর? দেখেছ তাকে?—তোমার নাম কি ভাই?

আমি মাটি।

অমন ম্লান মুখে সবার পিছনে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমরা যে সবাই তার অপেক্ষায় আছি। তাকে পাব বলে, তাকে সব দেবো বলে—তুমি এগিয়ে আস্‌ছ না কেন আমাদের মধ্যে?

আমি যে মাটি। আমার হাসিও নেই, সুরভিও নেই। বুক ভরা আছে শুধু মলিনতা। একে কোথায় ঢালবে? তাই চেপে রেখেছি নিজেরই বুকে। আমি ত তোমাদের মধ্যে আসতে পারি না। তোমরা যে সব শুভ্র সুন্দর। তাই আমি আছি দূরে দূরে। সে যখন তোমাদের দ্বারে অতিথি হয়ে আসবে— আমি শুধু একবার দেখ্‌ব তাকে—এইখান থেকে...

সবাই বলে উঠ্‌ল—আহা আহা ওর কিছুই নেই! এস না ভাই আমরা সবাই মিলে ওকে সাজিয়ে দিই—ঢেকে দিই ওর সব মলিনতা...

মাটি বল্‌ল—না-না, আমি চাই না ও সব কিছুই। আমার কাছেও যদি সে আসে,—দেবো তাকে আমার সকল কালি; উজাড় করে ঢেলে তার পায়ে ..

ফুল হেসে উঠ্‌ল আপনার মনে। বাতাস ভেসে গেল দিক্ হতে দিগন্তরে...নীল আকাশের গায়ে ডানা দুটি মেলে দিয়ে পাখী ডেকে ডেকে উড়ে গেল—এল, এল—সে এল !...

সবাই শুধাল—কে এল ?...ওগো কেমন তার রূপ ?...

তা-ত জানি না! কিন্তু এল, সে এল...বেরিয়ে পড়... আর দেরি নয়...

কোন পথে ?...ওগো কোন পথে...

তা ও জানি না!...তবু বেরিয়ে পড়...যে দিকে খুসী...ছুটে চল...

* * * *

উঠ্‌ল গান, ফুট্‌ল হাসি, ছুট্‌ল সবাই তার উদ্দেশে... হাসি-গান—চলার মধ্যে কেটে গেল বেলা!...কিন্তু কখন যে, তা কেউ জানে না...কে তাকে পেয়েছে, তাও কেউ জানে না!—কিন্তু দিয়েছে সবাই যা কিছু ছিল উজাড় করে...বুকখানিকে নিঙড়ে নিঃশেষ করে...

ফুরিয়ে গেছে সব। অন্ধকারে আর দেখা যায় না কিছুই ...আকাশের কোটি জলন্ত চোখ ও নিভে গেছে...কান্না কেঁদে উঠ্‌ল—হল না পাওয়া...দেখিনি তাকে...আসেনি সে...

মাটি বলে উঠ্‌ল—চুপ—চুপ। আমিও যে পড়ে আছি তার আশায় যুগ যুগান্তর ধরে...আমার ধূলা-মলিন বুকে তার পায়ের চিহ্ন পড়্‌বে—পড়্‌বে। আস্‌বে সে—আস্‌বে। পাব তাকে...তাই ত বেঁচে আছি...

সমাপ্ত

থেরী গাথা

বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের রচিত কবিতা।

এই গ্রন্থে মূল তাহার টীকা ও বাংলা পদ্য অনুবাদ আছে—

দাম এক টাকা মাত্র।

কথা নিবন্ধন

গল্প ও গাথার সমষ্টি

দাম এক টাকা মাত্র।

তপস্যার ফল

নবযুগের সমাজ চিত্র

দাম আট আনা

গীত গোবিন্দ

মূল পদ্যানুবাদ।

দাম বার আনা।

ছেলে মেয়েদের পড়িবার বই—

শিবনাথ

শ্রীসুনীতি দেবী প্রণীত।

দাম আট আনা মাত্র

সহজ ভাষায় মনোহর গল্পের মত করিয়া সাধু ও কবি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন চরিত লিখিত। শাস্ত্রী মহাশয়ের বড় একখানি ছবি ছাড়া আরও ছয়খানি ছবি আছে।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

ও

অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।